দাম ঃ ৪.০০ টাকা

স্বস্তিকা

৬১ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ।। ১৪ আষাঢ়, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২৯ জুন, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

পার্টিকে অক্সিজেন যোগাতেই লালগড় অভিযান

মাওবাদী দমনে বিকল্প নীতির জেরেই রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল হাতের বাইরে

বাসুদেব পাল ।। লালগড় অভিযানের তৃতীয় দিনে এক প্রকার বিনা রক্তপাতেই বেশ বড় ধরনের সাফল্য পেল কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ বাহিনী। ইতিমধ্যেই দীর্ঘ আট মাস মুক্তাঞ্চল হয়ে থাকা লালগড় থানার দখল এই মুহূর্তে পুলিশবাহিনীর হাতে। আপাতত পুলিশবাহিনী এগিয়ে চলেছে গোয়ালতোড়ের দিকে। ইতিমধ্যে গোটা দেশ জুড়েই সিপিআই (মাওবাদী)-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। অন্যদিকে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু জানিয়ে দেন, তারা নিষেধাজ্ঞা চাপানোর প্রস্তাব সমর্থন করেন না। শাসক দলের এই মনোভাবেই স্পষ্ট — পার্টিকে অক্সিজেন যোগাতেই লালগড়ে পুলিশি অভিযান। গত ২০ জুন লালগড় পরিদর্শনে যান কলকাতার বুদ্ধিজীবীমহল। পরে তাঁদের পক্ষ থেকে শাঁওলী মিত্র জানান, পুলিশবাহিনী সারেঙ্গা, গোয়ালতোড়, বিনপুর, পিড়াকাটা, ভীমপুর, শালবনি এলাকায় অত্যাচার চালাচ্ছে। পুলিশবাহিনী সেখানকার মেয়েদের বিবস্ত্র করে রাস্তায় এনে পিটিয়েছে, শ্লীলতাহানি করেছে, তাদের পানীয়তে মল-মূত্র ত্যাগ করেছে, ঘরের চাল বা ভাতের হাঁড়ি লাথি মেরে বাইরে ফেলে দিয়ে সন্ত্রাস চালিয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। পরে ত্রাণ নিয়ে লালগড় পৌঁছতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন দুই তৃণমূলী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুকুল রায় ও শিশির অধিকারী। শালবনীতে তাদের আটকে দেয় সিপিএমের কর্মী ও সমর্থকরা।

লালগড়ে মাওবাদীদের খোঁজে সশস্ত্র বাহিনীর অভিযান।

গত কিছুদিন ধরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে নানা খবরের ফলে জনমনে একটা বিভ্রান্তি যে, লালগড় ও সন্নিহিত এলাকায় যেন মাওবাদীরাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। অথচ আদতে ব্যাপারটা তা নয়। লালগড় একটা আধা শহর এবং যে জনজাতি সমাজ মাওবাদীদের জনভিত্তি, তাদের কেউ লালগড় শহরে বসবাস করেন না।

একটা সময় ছিল অর্থাৎ ৭৭-৭৮ সালে সি পি এম এবং সি পি আই লালগড়ের গরীব, খেটে খাওয়া ও দিন মজুরদের প্রতিনিধিত্ব করত। আবার ভোটের সময় বাদ দিলে দলগত রেষারেষি বা শত্রুতা ছিল না। '৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী হাওয়ায় লালগড় ব্লকে এবং তার অধীনে দশটি অঞ্চলেই সিপিএম-এর চূড়ান্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। লালগড়ে দলীয় সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন এমন দু'জন হলেন সুধীর পাণ্ডে এবং নিরঞ্জন দাস। নিরঞ্জন দাস লালগড় ৭ নং অঞ্চলের প্রথম নির্বাচিত অঞ্চল প্রধান এবং সুধীর পাণ্ডে লালগড় পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন। বিগত কুড়ি বছরে দলীয় সংগঠনিক নেতৃত্বেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অকৃতদার নিরঞ্জনবাবু মারা যান। সুধীরবাবু সিপিএম ছেড়ে নিজেই বিজেপি করতে শুরু করেন। নিরঞ্জনবাবুর জায়গায় চলে আসেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তপন দে। কিছু উঠতি যুবকের হাতে চলে আসে সিপিএমের নেতৃত্ব।

লালগড়ে মাওবাদী উৎপাতের শুরু ২০০৮ সাল নাগাদ। এর মাঝখানে আর একটু বলে নেওয়া দরকার। লালগড়ের আশপাশে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা জনজাতি প্রধান। ওই সব এলাকায় সাঁওতাল, ভূমিজ, মাল্লি, বাগদী, ভুগতা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বাস। এদের মধ্যে আবার 'মাহাত কুর্মী'-রা ভালো সংখ্যায় বসবাস করেন। তবে এঁরা পশ্চিমবঙ্গে আপার কাস্ট। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে শালবনী বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআই-কংগ্রেস জোট প্রার্থী ঠাকুরদাস মাহাত (সি পি আই) এবং ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে (সংরক্ষিত) কংগ্রেস প্রার্থী

(এরপর ৪ পাতায়)

স্কুলপাঠ্যে যৌনশিক্ষা অপ্রয়োজনীয়

রায় রাজ্যসভা প্যানেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্কুলপাঠ্যে যৌনশিক্ষা অপ্রয়োজনীয়। মানুষের আর পাঁচটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যেমন ক্রোধ, হিংসা, ভয়, লোভ ইত্যাদির মতো যৌনাকাঙ্ক্ষাও জন্মগত। তাই তাকে পাঠ্যসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে উদ্দীপিত করবার কোনও দরকার নেই। এমনই তীব্র ভাষায় স্কুলশিক্ষায় যৌনশিক্ষা পাঠক্রম ঢোকানোর কঠোর সমালোচনা করল এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসভার একটি প্যানেল। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রকের নির্দেশানুযায়ী বেশ কয়েক বছর আগেই দিল্লীর সি বি এস সি, আই সি এস সি বোর্ডসহ অধিকাংশ রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকস্তরের বোর্ডগুলি যৌনশিক্ষা বিষয়ক পাঠক্রম চালু করে। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে শিক্ষক মহলে। প্রশ্ন ওঠে, এর ফলে সমাজে যে এইডস সহ বিভিন্ন যৌন অসুখের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তার নৈতিক দায়িত্ব কি কোনওভাবেই এড়াতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার? চাপের মুখে পড়ে সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক জানায়, তারা যে পাঠক্রম চালু করছে তার নাম 'যৌনশিক্ষা' নয়,

(এরপর ৪ পাতায়)

হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে মার্কিন ষড়যন্ত্র রুখে দিলেন শঙ্করাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শেষ পর্যন্ত প্রবল চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার USCIRF (ইউনাইটেড স্টেটস কমিশন অন ইন্টারন্যাশানাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম)-এর পূর্বপরিকল্পিত ভারতবর্ষ পরিদর্শনের যাবতীয় পরিকল্পনা বাতিল করে দিল। ইতিপূর্বে কাঞ্চী কামকোটি পীঠের শঙ্করাচার্য USCIRF-এর ভারতে আসার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। মূলত আর এস এস এবং কাঞ্চির শঙ্করাচার্যের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বলে মনে করা হচ্ছে। ইউ এস সি আই আর এফ হল মার্কিন কংগ্রেস পরিচালিত একটি সংস্থা। যার উদ্দেশ্য বিশ্বের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর কী ধরনের আচরণ হচ্ছে তার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং সেই অনুযায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বিদেশ নীতি গ্রহণে পরামর্শ দেওয়া। ইউ এস সি আই আর এফ-এর প্রতিনিধিরা ভারতের আসার আগেই তাদের প্রকাশিত এক রিপোর্টে এদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নিয়ে সমালোচনা করেছিল। কাঞ্চীর শঙ্করাচার্য জয়েন্দ্র সরস্বতী এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন, "বিদেশী সরকারের উদ্দেশ্যমূলক সক্রিয়তা আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অহেতুক হস্তক্ষেপ করছে।" এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, যদিও ভারত সরকার ইউ এস সি আই আর এফ-কে এদেশে প্রতিনিধি পাঠাতে অনুমতি দিয়েছেন যাতে তারা এখানকার নির্ধারিত ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে জনগণের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কিন্তু অনধিকার চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে আসা ওই প্রতিনিধিদলকে আমাদের সরকার কখনই অনুমতি দিতে পারেন না। আমরা কখনই দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপ সহ্য

(এরপর ৪ পাতায়)

প্রাইভেট ইন্সটিটিউটগুলির রাশ টানছে ইউ জি সি

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। প্রাইভেট ইনস্টিটিউটগুলির ইঁদুর দৌড়ের কিছুটা হলেও লাগাম টানার উদ্যোগ নিল ইউজিসি (ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন)। দেশজুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো ইতি-উতি গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণের স্বপ্ন দেখাতেও ওস্তাদ এইসব ইনস্টিটিউটগুলি। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই ইউজিসি অনুমোদন নিয়ে সর্বত্র তাদের ব্রাঞ্চ খুলে বসেছে। তার মধ্যে বেশিরভাগ ইনস্টিটিউটই নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ভুরি ভুরি ফ্রানচাইজী নিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, তাদের নামে যে সমস্ত সেন্টারগুলি চলছে, সেগুলির প্রতিও কোনও নজর থাকে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্তি বাড়ে। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই সমস্যা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আশ্চর্যের ঘটনা হল, মূল ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষ বাজারে নিজেদের সেরা হিসাবে জাহিরে ব্যস্ত। অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের এবিষয়ে কোনও রকম সতর্ক করা হয় না। প্রতারিতও হতে হয় অনেককে। ইউজিসি সম্প্রতি এই ধরনের অব্যবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। সেই সঙ্গে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির লাগামহীন সেন্টার খোলার উপরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই চার্টার্ড ফিনানসিয়াল অ্যানালিসটস্ অফ ইন্ডিয়া ও এইচ এন ডি ইনস্টিটিউটের গোয়া সেন্টার বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ইউজিসি। এমন নির্দেশের খাড়া ঝুলছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপরও। এখানেই শেষ নয়, এর সঙ্গে ইউ জি সি প্রতিটি প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ন্যূনতম মর্যাদা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষ করে পরিকাঠামোর উন্নয়ণের দিকে। যার নিরীখে ইউজিসি ২২ নম্বর সেকশনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করে। দেশ জুড়ে গজিয়ে ওঠা সেন্টার, ফ্রানচাইজী ও অনুমোদিত কলেজগুলিকে নিয়মের বাঁধনে বাঁধতে তৎপর ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন। -এর মধ্যে রাজস্থানের নাম শীর্ষে। যেখানে ৯টি প্রাইভেট ইনস্টিটিউট ইউজিসির কবলে। উত্তরপ্রদেশে -৮, উত্তরাখণ্ডে- ৬ ও গুজরাটের ৫টি ইন্সটিউট এর মধ্যে রয়েছে। ইউজিসির এই উদ্যোগে শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীদের মধ্যেও স্বস্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এতে দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে বলেই তাদের আশা।

এক ঝলকে কিছু রাজ্যের বেসরকারি ইউনিভার্সিটিগুলির তালিকা —

ছত্তিশগড়

ডঃ সি ভি রমন ইউনিভার্সিটি
এম এ টি এস ইউনিভার্সিটি

গুজরাট

ধীরুভাই আম্বানি ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি
গণপত্ ইউনিভার্সিটি
কদি সর্ব বিশ্ববিদ্যালয়
নিরমা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
পন্ডিত দীনদয়াল পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটি

হিমাচলপ্রদেশ

চিতকারা ইউনিভার্সিটি
জেপি ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি

মেঘালয়

মার্টিন লুথার খৃস্টান ইউনিভার্সিটি
টেকনো গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি

মিজোরাম

দ্য ইনস্টিটিউট অফ চাটার্ড অ্যানালিস্টস অফ ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি

নাগাল্যান্ড

দ্য গ্লোবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি

পাঞ্জাব

লাভলি প্রফেসনাল ইউনিভার্সিটি

রাজস্থান

ভগবন্ত ইউনিভার্সিটি
জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি
জয়পুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
জ্যোতি বিদ্যাপীঠ ওমেনস্ ইউনিভার্সিটি
মেওয়ার ইউনিভার্সিটি, চিতোর
এন আই এম এস ইউনিভার্সিটি।
সিংহানিয়া ইউনিভার্সিটি।

সিকিম

ইস্টার্ন্ ইনস্টিটিউট ফর ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং ইন ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি
সিকিম মনিপাল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ, মেডিকেল, টেকনোলজি সাইন্সেস্

ত্রিপুরা

আই সি এফ এন আই

উত্তরপ্রদেশ

অ্যামেতি ইউনিভার্সিটি
ইনটের্গাল ইউনিভার্সিটি
জাগোদুর্গা ইউনিভার্সিটি
মঙ্গোলয়াথান ইউনিভার্সিটি
সারদা ইউনিভার্সিটি
মহম্মদ আলি জাহুর ইউনিভার্সিটি
স্বামী বিবেকানন্দ সুভ্রাতি ইউনিভার্সিটি।
তীর্থঙ্কর মহাবীর ইউনিভার্সিটি

উত্তরাখণ্ড

দেব শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ডন ইউনিভার্সিটি
হিমগিরি নব বিশ্ববিদ্যালয়
আই সি এফ এ আই
ইউ পি এস
ইউনিভার্সিটি অফ পতাঞ্জলি

এই সময়

লালকেল্লা

এবার সংস্কারের মুখ দেখতে চলেছে দিল্লীর লাল কেল্লা। সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্ট লালকেল্লা সংস্কারের অনুমতি দিয়েছেন। আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এই কাজ করবে বলে জানা গেছে। বেশ কয়েক কোটি টাকা খরচ করা হবে এই কাজে। কমপ্রিহেনসিভ কনজারভেশন ম্যানেজমেন্ট প্লানের আওতায় সংস্কারের কাজ শুরু হবে। বসানো হবে অডিও ভিস্যুয়াল গাইড। খোলা হচ্ছে স্মারকের নতুন কাউন্টার। সেই সঙ্গে শৌখিন বাথরুমেরও ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

বিপাকে বুদ্ধ

আবারও বিপাকে পড়লেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর 'লালগড় অভিযান' নিয়েও রাজ্য-রাজনীতিতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন বুদ্ধ দেববাবু এতদিন পরে কেন এই অভিযান শুরু করলেন। নভেম্বর মাস থেকে লালগড়ের থানা কব্জা করে রাখে মাওবাদীরা। প্রশাসনকেও অকেজো করে রাখে তারা। ছ'মাসের ওপর লালগড় মাওবাদী কবলিত থাকলেও, মুখ্যমন্ত্রী এর আগে পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ফলে বিরোধীদের মতে, বামফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের দুর্নীতি ঢাকতেই এই অভিযান। এরাজ্যে কেন মাওবাদী নিষিদ্ধ করা হল না — এই প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে।

আশার আলো

সংস্কৃততেই আশার আলো দেখছেন কাশ্মীরি তরুণ পন্ডিতরা। কাশ্মীর উপত্যকার বাইরে বড় হওয়া পণ্ডিতরা চাইছেন কাশ্মীরি লিপি নয়, দেবনগরী লিপি চালু হোক তাদের জন্য। কাশ্মীরে মূলত কাশ্মীরি ভাষা ও লিপিরই চল বেশি। এই ভাষা সাধারণত পার্সি ও আরবীর যুগ্ম রূপ। এই ভাষা প্রবীণ কাশ্মীরী পন্ডিত ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য হলেও, তরুণ পণ্ডিতরা চাইছে কাশ্মীরী ভাষায় দেবনগরী লিপি ব্যবহৃত হোক। সদ্য সমাপ্ত ক্ষীর ভবানী মন্দিরের মেলায় এই বিষয়ে জনমতও গড়ে ওঠে। জনগণের সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। খুব শীঘ্র তা কার্যকরী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হিন্দুত্ব

হিন্দুত্বই একমাত্র পথ। সম্প্রতি দলের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে নির্বাচনে পরাজয়ের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কোনও কোনও নেতা হিন্দুত্বকে দায়ী করেছেন। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং ও শ্রীআদবানী দুজনেই হিন্দুত্বকে দলের আদর্শবাদের ভিত্তি হিসাবে তুলে ধরেন। ফলে হিন্দুত্বের পথেই যে দল হাঁটবে তা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় শ্রী সিং-এর মন্তব্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লালকৃষ্ণ আদবানীও সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। ১৯৮০ সালে দেওরসজী বিজয়া দশমীর বৌদ্ধিকে বলেন, পরিবর্তন না হওয়ার অর্থ মৃতর সমান। সঙ্ঘের পরিবর্তন হচ্ছে। তবে সব কিছুই হিন্দুত্বের পথ ধরে। বিজেপির মধ্যেও পরিবর্তন আসছে, কিন্তু হিন্দুত্বকে বাদ দিয়ে নয়।

মোবাইল

মোবাইল কি শুধুই কথা বলার জন্য! ভারতের ক্ষেত্রে এই ধারণাটা অমূলক নয়। ভারতের বেশিরভাগ মোবাইল ব্যবহারকারীর কাছে মোবাইলের গুরুত্ব অন্য জায়গায়। কথা বলার থেকেও এস এম এস, ইন্টারনেট, এম পি থ্রি, ভিডিও গেম খেলায় বেশি পছন্দ ভারতীয়দের। সম্প্রতি এক আইটি সেক্টরের সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। কল চার্জ কম হলেও, এখনও এস এম এস-ই সবথেকে প্রিয় মোবাইল অবজেক্ট। ৯২ শতাংশ মানুষ এস এম এস প্রিয়। প্রায় অর্ধেক মোবাইল গ্রাহকের কাছে মোবাইলে গান শোনা অন্যতম প্রিয় অপশান। এর পরও কি কথা বলার জন্যই মোবাইল। ভারতের একশ্রেণীর মানুষ কিন্তু আজও শুধু কথা বলার জন্যই মোবাইল ব্যবহার করে।

৩৩-এ

পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল হিসাবে ৩৩ বছরে পা রাখল রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার। কম্যুনিজমের বুলি আওড়েই দীর্ঘ ৩৩ বছর কাটিয়ে দিল। এতে ভুলও কম হয়নি বামফ্রন্টের। লোকাল কমিটি থেকে পলিটব্যুরো সর্বত্রই কোনও না কোনও ভুল করেছেই। যার খেসারত দিতে হচ্ছে দলকে। গত কয়েক বছরে বামফ্রন্টের বিভিন্ন পদক্ষেপ আরও কোণঠাসা করেছে দলকে। প্রমোদ দাশগুপ্তের সমসাময়িক প্রবীণ নেতা জ্যোতিবসু তাঁরই এক সাক্ষাৎকারে দলকে বিভিন্ন পদক্ষেপের ত্রুটিগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। সেই সঙ্গে পথ দেখান কীভাবে ফিরে আসতে হবে স্বমহিমায়। কিন্তু বুদ্ধ-বিমান-বিনয় কী পারবে এই গুরু দায়িত্ব সামলাতে। প্রশ্নটা শুধু বিরোধী শিবিরে নয়, খোদ বামফ্রন্টের শরিকদলগুলির মধ্যেও।

ঘুমই হাতিয়ার

এখন আর ঘুমের জন্যই ঘুম নয়। লেখা পড়ারও মোক্ষম দাবাই হতে পারে ঘুম। ঘুমের পর যে কোনও কিছুই মনে রাখা যায় খুব সহজে। স্মৃতিতে থাকেও অনেকদিন। ব্রেনের কার্যকারিতাও বাড়ে এতে। সদ্য ১৮ থেকে ২২ বছর বয়সী পড়ুয়াদের মধ্যে পরীক্ষা চালালে এই চাঞ্চল্যকর তথ্যটি উঠে আসে। বস্টনের হার্ভাড মেডিকেল স্কুল এই পরীক্ষা চালায়। রাতের গভীর নিদ্রার পর সকালের লেখা পড়াও খুব সহজেই মনে রাখা যায়। ফলে 'ঘুম'-কেও হাতিয়ার বানানো যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

হিন্দীর হয়ে

এবার থেকে হিন্দীতে লড়া যাবে কোর্টের বিভিন্ন মামলা। সম্প্রতি দিল্লী হাইকোর্ট এই কথা জানিয়েছে। কোর্টের প্রধান বিচারপতি এপি সাহ এই রায় দেন। অল ইন্ডিয়া ল' ইয়ার্স ইউনিয়ন (এ আই এল ইউ)-ও এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে। ইউনিয়নের মতে, হিন্দীতে মামলা লড়ার অর্থ আইনজীবীরা আইন জানেন না এমন নয়। ভাবের আদান-প্রদানের স্বার্থে হিন্দী ভাষা ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আদালতের এই বক্তব্যের পরে হিন্দীতে আর কোনও বাধা থাকল না।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

লালগড়ে মাওবাদী নিকেষ অভিযান

মেদিনীপুরের জঙ্গল-মহলে মাওবাদীদের আনাগোনা ও হানাহানি নতুন নয়। এতদঞ্চ লে মাওবাদীদের আস্ফালন চলিতেছে কয়েক বছর ধরিয়াই। কখনও মাইন ফাটিয়া পুলিশের গাড়ি উড়িয়া যায়, তো কখনও কৌটা বোমায় হাত দিয়া তরুণ পুলিশ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। এমন নৃশংসতার উদাহরণ আরও অনেক আছে। কিন্তু কেন জানিনা পশ্চি মবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের এই সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের দমনে তেমন গা ছিল না কখনই। ঘটনা ঘটিবার পর কয়েকদিন গরম গরম বক্তৃতা দান ছাড়া কিছুই তারা করে নাই। বিরোধী দলেরও যে ভূমিকা খুব একটা সদর্থক ছিল তাহাও নয়।

এইসবের ফাঁক-ফোকরে মাওবাদীরা গরীব নিরক্ষর কর্মহীন মানুষদের উপর একপ্রকার ভীতির মনোবিকার সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ক্রমে ক্রমে পর্যুদস্তই শুধু নয়, তাহাদের মধ্যেকার বেকার যুবক-যুবতীদের সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিতও করিয়া তুলিয়াছে। এলাকার পর এলাকাকে প্রশাসন শূন্য করিয়া তুলিয়াছে। ভীত জনগণকে তাহাদের আজ্ঞাবহ করিয়া তুলিয়াছে। মাওবাদীদের মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস হরণ করিয়াছে। এইভাবে পশ্চি ম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার ২৮টি থানা এলাকাতে তাহাদের ক্ষমতা ব্যাপ্ত করিয়াছে। থানাগুলিকে হাতের পুতুলে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু রাজ্য প্রশাসনের কেন এই অনীহা? বিরোধী নেতা-নেত্রীদেরও যেন গা-ছাড়া ভাব। ওরা আছে থাক, ভবিষ্যতে কাজে লাগিতে পারে এমনই একটা ভাব। এইভাবেই মাওবাদীরা আজ রাষ্ট্রের পক্ষে এক বিপজ্জনক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

এখন শুরু হইয়াছে দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপের পালা। প্রশ্ন উঠিয়াছে, মাওবাদীদের পিছনে কাহারা? কেহ বলিতেছে মাওবাদীরা সিপিএমের-ই সৃষ্টি, আবার কেহ বলিতেছে তৃণমূলের সমর্থক বুদ্ধি জীবীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই নকশালপন্থী বা মাওবাদীদের যোগাযোগ সুবিদিত। এই বুদ্ধি জীবীদের তুষ্ট করিতে মমতা এবং তাহার দল মাওবাদীদের এই বাড়বাড়ন্তের বিরুদ্ধে কখনও সোচ্চার হয় নাই। কেহ কেহ বলিতেছে, এইসব বুদ্ধি জীবীদের মাধ্যমে নকশালপন্থী বা মাওবাদীদের সমর্থন আদায়ের ব্যাপারটাও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাহার একটু আভাস যেন মাওবাদী নেতা কিষেণজী বা কোটেশ্বর রাওয়ের বিবৃতিতেও মেলে।

কিষেণজী মমতার বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়িয়াছে এই বলিয়া যে, নির্বাচনে মমতার দলকে আমরা সমর্থন করিয়াছিলাম বলিয়াই মমতার দল আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়াই তাহার সরকার মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামিয়াছে। ইহার ফলাফলের জন্য যেন মমতা প্রস্তুত থাকে। এই হুঙ্কার শুনিয়াই মমতার সমর্থক বুদ্ধি জীবীদের দল এই ভয়ঙ্ক র দাবদাহের মধ্যেও তড়িঘড়ি লালগড়ে রওনা দিয়াছেন। মাওবাদীদের গণসংগঠন নামে পরিচিত পুলিশী সন্ত্রাসবিরোধী জনগণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে বৈঠক করিয়াছেন। তাহলে প্রমাণ হইল মাওবাদীদের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগের একটা সূত্র নিশ্চ য়ই আছে। অবশ্য বৈঠকে কী কথা হইল তাহা এখনও অজানা। তাহাদের আর এক বুদ্ধি জীবী মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে নকশালদের সুসম্পর্ক কাহারও অজানা নয়।

কিষেণজীর হুঙ্কারে মমতাও কেন জানি না বড় ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি তড়িঘড়ি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত লইয়াছেন। কেন কেন্দ্রের সরকার বামফ্রন্ট সরকারের কথায় মাওবাদী দমনে নামিল ইহাতেই তাহার ঘোর আপত্তি। তিনি তাহার দুই দলীয় মন্ত্রীকে রিলিফসহ লালগড়ে পাঠাইয়াছেন — নিশ্চ য়ই উদ্দেশ্য দলীয় ভিত্তি রক্ষা করা। দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় বাহিনী বা যৌথ বাহিনী তাহাদের অভিযান ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেই দেয় নাই।

আসলে পশ্চি মবঙ্গে সবই রাজনীতি। কে যে কখন কাহার দিকে বলা মুশকিল। রাজনীতি এখানে সুস্থ নয় - সবই ফন্দি-ফিকির। দলীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। এতকাল মানুষ জানিত বামফ্রন্ট সরকার তথা সিপিএমই এই নকশালদের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা যেখানেই ভয়-ভীতির রাজত্ব কায়েম করিয়াছে ভোট বয়কটের ডাক দিয়াছে সেখানেই সিপিএম তথা বামদলগুলি বাজিমাত করিয়াছে। ইহাই চলিতেছিল বেশ সাবলীল গতিতে। এই কারণেই মাওবাদীদের নিষিদ্ধ করার কথা উঠিলেই তাহারা ভাঙ্গা রেকর্ড বাজাইত "নিষিদ্ধ করণ নয়, আমরা রাজনৈতিক মোকাবিলায় বিশ্বাসী"। রাজনৈতিক মোকাবিলাটি কী জিনিস তাহা ভগবানই জানেন। যেখানে স্পষ্ট কথা বলিতে অসুবিধা আছে সেখানেই তাহারা এই "রাজনৈতিক মোকাবিলার" রেকর্ডটি বাজাইয়া থাকেন।

কিন্তু সবই তো বুঝিলাম। তবে আজ কেন এই তড়িঘড়ি কেন্দ্রীয় সরকারের পায়ে পড়িয়া কেন্দ্রীয় বাহিনী লইয়া যৌথভাবে এই অভিযানে নামা। দাবার ঘুঁটির চাল কি একটু বেচাল হইয়া পড়িয়াছে? দোষ যদি চাপে তো কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরেও চাপুক। তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ এই সরকারে তো তাহাদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসও আছে। দায় সকলের উপরেই পড়িবে। তখন বাধ্য হইয়াই সকলে বিষয়টি চাপিয়া যাইবে। তাই এই সুযোগ।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে দোষারোপ করিতেছে এই বলিয়া যে ১১টি রাজ্য এই মাওবাদীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। অন্যদিকে পশ্চি মবঙ্গ সরকার রাজ্যে এই মাওবাদীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতেছে কিনা তাহা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। ভাবখানা এমনই যেন কেন্দ্রীয় সরকার চাপ দিতেছে বলিয়াই এই নিষিদ্ধ করণে তাহারা বাধ্য হইতেছে। ভবিষ্যতে এই কারণটি কাজে আসিতেই পারে।

ধূর্ত শিয়াল কাদায় জলে পড়িয়া গেলে ছলনা করিয়া কুমীরের সাহায্যেই নদীর পাড়ে আসে। আর কাজের সময়ে কাজী কাজ ফুরালো পাজি — এই তত্ত্ব তো কমিউনিস্ট দের ভালই জানা আছে।

মিশন ছিল, কিন্তু ভিশন ছিল না

দেবীপ্রসাদ রায়

পঞ্চ দশ সাধারণ নির্বাচনের শেষে ভারতীয় জনতা পার্টির এক বিপর্যস্ত অবস্থা প্রকটিত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে বিপর্যয় ঘটতেই পারে কোনও দলের, কিন্তু সেই বিপর্যয় যেভাবে বিজেপি নেতৃবৃন্দকে দিশাহারা করেছে তাতে এই দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আজ সঙ্ক টে। ভারতের বিপুল জনসাধারণকে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে নেতৃবৃন্দের এই পশ্চা দপসরণ হয়তো সাময়িক, তবুও বিশেষভাবে ক্ষতিকর। বস্তুতঃপক্ষে ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় একবার ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া বিজেপি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলেও অতিরঞ্জনের আলোতে নিজেরাই প্রতারিত হয়েছে এবং ভারতীয় জনসাধারণকে নিজেদের প্রক্ষিপ্ত আলোতে আলোকিত করে এক মূর্খের স্বর্গ রচনা করেছে এবং সেই স্বর্গচ্যুত হয়ে আজ বাস্তবতায় ফিরতে বিহ্বল হয়েছে। হিন্দুত্ব আদর্শ আশ্রয়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে গিয়ে কখন সেই আদর্শ থেকেই বিচ্যুত হয়েছে তা বুঝতে পারেনি। সংখ্যালঘুর মানসিকতাকে অনুধাবন না করে যাদের তারা সমালোচনা করে প্রতিনিয়ত, সেই কংগ্রেসেরই সংখ্যালঘু তোষণের সংক্ষিপ্ততম পথের অনুসরণকারী হওয়ার প্রয়াস পেয়েছে।

পাকিস্তানে গিয়ে লালকৃষ্ণ আদবানীর জিন্না-প্রশস্তি সেই বিচ্যুতিরই প্রমাণ। যে নারকীয় অত্যাচারের মুখে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতীয় জনসাধারণকে ঠেলে দিয়ে এক রক্তাক্ত পরিস্থিতিতে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন এনে জিন্নার পাকিস্তান সৃষ্টি ও ক্ষমতা দখল, সেই জিন্নার প্রশস্তিই কি সত্যই মুসলিম সমর্থন এনে দিতে পারে আদবানীকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস সাধনের তিক্ত স্মৃতি ভুলিয়ে? অন্যদিকে হিন্দুদের স্বজন সর্বস্ব হারানোর বেদনা শূন্যে বিলীন হবে?

একে একদিকে মুসলিমরা সস্তা ভোট ব্যাঙ্ক দখলের রাজনৈতিক প্রয়াস ছাড়া কিছুই ভাবেনি লালকৃষ্ণ আদবানীর প্রয়াসকে। আর তেমনই হিন্দুরাও এই প্রয়াসকে স্থূল-তোষণ মনে করে 'বিশ্বাসযোগ্যতার হানি' বলেই মনে করে। সেই আদবানীর নেতৃত্বের দল বি জে পি'র উপর নির্ভরতার এই যুগপৎ হানি প্রকটিত হয়েছে এই নির্বাচনে। বিজেপি কাঙ্ক্ষিত ভারতীয় জাতি-সত্তায় উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে ইসলামী ধর্মীয় সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে আগ্রহী। মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে মুসলিম তোষণ রাজনীতির ধারক কংগ্রেস বা দাঙ্গা সৃষ্টিতে সমর্থ মুসলিমদের কাছে মাথা নত করার ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেসই বেশি গ্রহণযোগ্য। যে 'ভিশন' থাকলে এবং সন্তত হলে বিজেপি ধীরে ধীরে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পারত সে 'ভিশনই' ছিল না। বিজেপি-র নেতৃত্বে এন ডি এ দেশে বেশ কিছু উন্নয়ণ প্রয়াস এবং উন্নয়ণ ঘটিয়েছিল —

(১) আন্তর্জাতিক বাজারে প্রাক্তন সরকারের আমলে বন্ধক দেওয়া সোনা ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

(২) বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ড ার স্ফীত হচ্ছিল। সেই স্বচ্ছলতা নিয়ে পরবর্তী ইউ পি এ সরকার উন্নয়ণে গতি এনেছিল।

(৩) দেশব্যাপী শিল্প উন্নয়ণের পরিকাঠামো নির্মাণে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

(৪) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বহুমাত্রিকবহু প্রতীক্ষিত নদীসংযোগ পরিকল্পনা রূপায়ণে উদ্যোগে নেওয়া হয়েছিল।

(৫) পরমাণু প্রযুক্তিতে নতুন প্রয়াস চালানো হয়েছিল আন্তর্জাতিক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করার বলিষ্ঠতা দেখিয়ে, যার ফলশ্রুতি ২০০৫ সালে ভারতে এসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের পরমাণুচুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ।

> **"পরমাণুচুক্তি সম্পাদনের বাস্তব পশ্চাৎপট যে তাদেরই তৈরি সেই কথা দেশব্যাপী প্রচারে না এনে সি পি আই (এম)-র সাথে এই চুক্তির বিরোধিতা বিজেপি-কে যেমন দেশের স্বার্থ বিরোধিতার দায় গ্রহণে বাধ্য করেছে দেশবাসীর কাছে, তেমনই উপযুক্ত 'ভিশন'-এর অভাবে তার কৃতিত্বকে লোকচক্ষুর অন্তরালে পাঠিয়ে দিয়ে ছিনতাই করতে দিয়েছে এক 'সাফল্য'কে।"**

এগুলিকে সার্থকভাবে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারেনি বিজেপি কতকগুলি স্থূল বিজ্ঞাপনের মধ্যে ডুব গিয়ে। সাধারণ মানুষ আর কিছু বুঝুক বা নাই বুঝুক সোনা বন্ধক দেওয়ার অসহায় অবস্থা বোঝা এবং সেই সোনা ছাড়িয়ে আনার সাফল্যের তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারে। অথচ সেই ব্যাপারটিকে জনসাধারণের সামনে আনার 'ভিশন'ই বিজেপি-র ছিল না। নির্বাচনী সাফল্যকে ছিনতাই হতে দিয়েছে বিজেপি, ছিনতাই করেছে কংগ্রেস — ২০০৪ সালে। ২০০৯ সালের নির্বাচনেও একই ধরনের 'ভিশন'-এর অভাব প্রকটিত হয়েছে বিজেপি-র ইন্দোমার্কিন পরমাণুচুক্তি ভূমিকা নিয়ে। ১৯৯৮ সালে 'পোখরান'-এ দ্বিতীয় সফল পরমাণু বিস্ফোরণ পরীক্ষাগুলির জন্য মার্কিন নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী বিরোধিতা সংগঠিত হলেও অটলবিহারীর দৃঢ়তায় সে বিরোধিতা ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। ভারতে আর্থিক সঙ্ক ট সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস অটল বিহারীর নেতৃত্বে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছিল। ভুল পদক্ষেপের জন্য হাত কামড়াতে হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে। বসুবিজ্ঞান মন্দিরে একটি অনুষ্ঠানে এসে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে স্বীকার করতে হয়েছিল ভারতে অর্থ অনুদান বন্ধ করে তারা ভুল করেছে— তারা ভুল স্বীকার করে নিচ্ছে। ভারতীয় বাজার ক্রমশ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মার্কিন বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার ও বৃদ্ধি র দায়িত্ব পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করেছিল ভারতের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনে আগ্রহান্বিত করতে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই চুক্তি সম্পাদনের কৃতিত্ব ছিনতাই করার জন্যই বিরোধী এন ডি এ নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করতে চায়নি, করেনি। পরমাণুচুক্তি সম্পাদনের বাস্তব পশ্চাৎপট যে তাদেরই তৈরি সেই কথা দেশব্যাপী প্রচারে না এনে সি পি আই (এম)-র সাথে এই চুক্তির বিরোধিতা বিজেপি-কে যেমন দেশের স্বার্থ বিরোধিতার দায় গ্রহণে বাধ্য করেছে দেশবাসীর কাছে, তেমনই উপযুক্ত 'ভিশন'-এর অভাবে তার কৃতিত্বকে লোকচক্ষুর অন্তরালে পাঠিয়ে দিয়ে ছিনতাই করতে দিয়েছে এক 'সাফল্য'কে।

বিজেপি নেতৃত্বের 'ভিশন'-এর দৈন্য প্রকটিত হয়েছে গুজরাট এবং নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গুজরাটের উন্নয়ণ কংগ্রেস নেতাদের দ্বারাও স্বীকৃত। সুতরাং উন্নয়ণের পথে যেতে গেলে বিজেপি প্রশাসনকে দেশের মানুষের সামনে আনাই যায়। কিন্তু অত্যুৎসাহী ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীকে সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আনার কাণ্ড জ্ঞানহীন প্রচার ও প্রয়াস মুসলিম জনগণের কাছে কাঙ্ক্ষিত হবে কিনা একবারও মনে হল না বিজেপি নেতৃত্বের।

গোধরা পরবর্তী দাঙ্গার জন্য নরেন্দ্র মোদী প্রশাসনের যে চরিত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিভাত হয়েছিল, তিস্তা শীতলবাদ প্রমুখ বামপন্থীদের চাতুর্যে এবং কর্মদক্ষতায় তার সামনে পিছু হটেছিল বিজেপি নেতৃ বৃন্দ। বিজেপি বিদ্বেষ প্রসূত অপপ্রচারের ফাঁক-ফোকরগুলি অনুসন্ধান ও প্রচার করার মতো বুদ্ধি মত্তা, ক্রিয়াশীলতা ছিলই না বিজেপি সংগঠনের। মুসলিম গণহত্যার বিবরণে যখন বামপন্থী বুদ্ধি জীবীরা সোচ্চার সেই সময়ে বামপন্থী বুদ্ধি জীবীপুষ্ট পত্রিকা Economic and Political Weekly সংখ্যায় বেরিয়েছিল শ্রীকান্ত সন্তানীর প্রবন্ধ —

Gujrat's burning Train : India's In ferno''.... Our intellectuals are known for their great facility with wores but not precision in their use. They have taken likenties with phrases to establish the depth of their auguish at the happenings of Gujrat. One has seen terms such as

(এরপর ৪ পাতায়)

পরলোকে স্বস্তিকা-র প্রাক্তন সম্পাদক ভৈরব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ১৪ জুন রবিবার সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-র ভূতপূর্ব সম্পাদক ভৈরব ভট্টাচার্য পলতায় নিজ বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। তিনি বেশ কিছু দিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন। বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর শহরে ১৯২৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এক সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। এই সময়ই তিনি কলকাতায় আসেন এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বস্ত অনুচর রূপে স্বীকৃত হন। ১৯৪৬-৪৭ সালে 'দৈনিক হিন্দুস্থান'-এ তাঁর সাংবাদিকতায় হাতে-খড়ি।

১৯৪৮ সালে বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমেন্দ্রনাথ পণ্ডিত-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সহকারীরূপে যোগ দেন। সেসময় সরকারি আদেশে 'স্বস্তিকা' প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'স্বস্তিকা'য় সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন শ্রীভট্টাচার্য। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পারিবারিক প্রয়োজনে সরকারি চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ১৯৮৭

সালে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে অবসর নেন। কিন্তু তাঁর কলম কখনও থেমে থাকেনি। স্বনামে এবং কূটমল ভট্ট ছদ্মনামে তিনি স্বস্তিকায় দীর্ঘদিন লিখেছেন। ১৯৯৭ সালে স্বস্তিকা-র সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (২৪.৮.৯৭ - মহাজাতি সদন সভাগার) তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। শ্রীভগবানের কাছে স্বস্তিকা পরিবার তাঁর প্রয়াত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছে।

পার্টিকে অক্সিজেন যোগাতেই লালগড় অভিযান

(১ পাতার পর)

অমিয় কিস্কু (ধর্মান্তরিত ও খৃস্টান) বিজয়ী হন। তারপর '৭৭ সাল থেকে এতাবৎ যাবতীয় নির্বাচনে দুটি কেন্দ্র থেকেই বিধানসভা ও লোকসভায় সিপিএম প্রার্থীরাই জিতে এসেছেন। তবে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম-এর পায়ের তলার মাটি আলগা হতে থাকে। জনজাতি সম্প্রদায় বিশেষত, সাঁওতাল সমাজ সি পি এম থেকে সরে গিয়ে ঝাড়খণ্ড পার্টির ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। তারাই স্থানীয়ভাবে সিপিএম-এর কাছে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। প্রমাদ গোণে সিপিএম-এর তরুণ নেতৃত্ব। তারা এদের মোকাবিলা করতে সফল হয়নি।

এরই মাঝে ঘটে ২০০৮-এর ২ নভেম্বরে শালবনীতে জিন্দালদের ইস্পাত কারখানার শিলান্যাস করতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুদ্ধবাবু অক্ষত অবস্থায় শিলান্যাস করে ফিরে এলেও মাইন বিস্ফোরণ ঘটে মেদিনীপুর — শালবনী রুটে — ভাদুতলার কাছে কলাইচন্ডী খালের পাশের লাইট পোস্টে। একটি পুলিশগাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওইদিন রাতেই লালগড় থানার পুলিশ অ্যাকশনে নামে। শুরু হয় পুলিশকে বয়কট, এলাকায় ঢুকতে না দেওয়া এবং জনগণের কমিটি গঠন। এই সুযোগটাই নেয় বহিরাগত মাওবাদীরা। জনগণের কমিটির ডাকে হাজারে হাজারে জনজাতি একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে — লালগড় থেকে কলকাতা পর্যন্ত সমাবেশ হয়। দাবী ওঠে পশ্চিম মেদিনীপুরের এস পি (তৎকালীন) ও লালগড় থানার ওসি-র ক্ষমা চাওয়ার। প্রশাসন আজও নত হয়নি। বুদ্ধবাবুর সরকার ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলেও সাঁওতাল মহিলারা নেননি। আবারও জোরদার আন্দোলনে উত্তাল হয় এলাকা। এবার সি পি এম নেতাদের বাড়ি, দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে ক্ষুব্ধ জনতা। ধরমপুরে লালগড় জোনাল কমিটির নেতা অনুজ পান্ডের দোতালা বাড়ি গত ১৫ জুন ভেঙে ফেলা হয়। ১৬ জুন লালগড় সিপিএমের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর হয়। এরপরই রাজ্য-প্রশাসন অভিযানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

১৮ জুন থেকে অভিযানে নামে পুলিশ, সি আর পি এফ, বি এস এফ-এর সংযুক্ত বাহিনী। ২০ তারিখে দুপুরে লালগড় থানায় ঢোকে নিরাপত্তা বাহিনী। ২০০৪-এর জুন মাসে বেলপাহাড়ি থানার আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়। জানা যায় আরও অনেক আমলাশোলের কথা। অথচ দলীয় নেতাদের সম্পত্তি, গাড়ি, বাড়ি সবই হয়েছে। লালগড়ের 'কামিয়েনিস'-দের এখন তিন মাথা — জয়দেব গিরি, তপন দে ও অনুজ পাণ্ডে।

বস্তুত এই নেতারা কদিন আগে জনগণের কমিটির ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালান। প্রশাসনিক স্তরে অভিযানের আসল উদ্দেশ্য মাওবাদী দমনের নামে নেতা, দল ও সংগঠনকে অক্সিজেন যোগানো এবং সেইসঙ্গে বিরোধীদের দাবিয়ে রাখা। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ঠিকমতো রিগিং না হওয়াতে লালগড় ব্লকের দশটি অঞ্চলের ছয়টি অঞ্চলই বিরোধীদের দখলে।

পঞ্চায়েত সমিতিও ঝাড়খন্ডের। বেশ কিছু সি পি এম নেতা কর্মী তথাকথিত মাওবাদীদের হাতে নিহত হয়েছেন একথা সত্য। তবে তারাই বা শুধু টার্গেট কেন — অন্যরা নয় কেন —এই প্রশ্ন উঠেছে। লালগড়ে রথতলার মোড়ে জমিদারদের এক বিশাল বাড়ি এখন কিছু সিপিএম নেতার দখলে বলে অভিযোগ। একমাত্র ওয়ারিশন মারা গেছেন। সারা রাজ্যে ভোটের হিসেবে তো বেশির ভাগ মানুষই সি পি এম বিরোধী। তবে কি তারা সবাই মাওবাদী? মাওবাদী তকমা দিলে গ্রেপ্তার ও আটক রাখা সুবিধাজনক। এবার লালগড়ে কতজন সত্যিকার অর্থে মাওবাদী ধৃত বা নিহত হন সেটাই দেখার।

মিশন ছিল কিন্তু ভিশন ছিল না

(৩ পাতার পর)

'Genocide' and 'holocust' used by our men and women of letters. These words have come to be associated with specific historic events of infinitely worse magnitude and are not appropriate to in the present debate." বিজেপি নেতৃবৃন্দ এ সবের খোঁজ রাখেন? রাখা উচিৎ ছিল — তা হলেই পাল্টা প্রচারে জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্ট বিভ্রান্তি অনেকটা কাটতো মুসলিমদেরও।

অরুন্ধতী রায়ের উৎসাহী অপপ্রচার পরে ক্ষমা প্রার্থনা, তিস্তা শীতলবাদের এনজিও 'Citizens for peace and justice' -এর মিথ্যাচার এগুলি জনসমক্ষে এনেছেন? শুধু দলীয় পত্রিকায় এগুলির উল্লেখই কি যথেষ্ট? বামপন্থী ও কংগ্রেসী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ভূমিকাহীন থাকব আর নির্বাচনের সময়ে সেই অপপ্রচারের শিকার 'নরেন্দ্র মোদীকে' সামনে এনে 'কিস্তিমাৎ' করার নির্বুদ্ধি তা দেখাবো — এটা চলে? এবারের নির্বাচনে পুনঃ পুনঃ কান্দাহার বিমান ছিনতাই কান্ডের উল্লেখ করে বিজেপিকে হতমান করার প্রয়াস যেভাবে হয়েছিল এবং যেভাবে বিজেপি নেতৃবৃন্দ তার সামনে বিহ্বলবৎ আচরণ করেছিল বিজেপি-রই সাধারণ সমর্থকরা তা মেনে নিতে পারেনি। বিজেপি-র কোনও নেতা পাল্টা আক্রমণে বলতে পারেনি যে তার আগেই মুফতি মহম্মদের মেয়েকে নিয়ে অপহরণের নাটক যেভাবে জঙ্গিদের মুক্ত করতে বাধ্য করেছিল কংগ্রেসকে, মুফুতি মহম্মদকে তোষণ করার জন্য সেই উদাহরণই তো বাধ্য করেছিল বিজেপি সরকারকে নরম হতে। কারণ মন্ত্রীর মেয়ে বলে জঙ্গিদের মূল্যে তাকে উদ্ধার করা হবে আর সাধারণ বহু বিমান যাত্রীদের প্রাণকে তুচ্ছ করে জঙ্গিদের মধ্যে বিজেপি সরকারকে দৃঢ়তা দেখাতে হবে — তা কি সম্ভব? কংগ্রেসের মুসলিম তোষণ নীতিই প্রকারান্তরে বাধ্য করেছে বিজেপি-র দৃষ্টিভঙ্গীকে নরম করতে। মনমোহন সিং থেকে বালখিল্য নেতা রাহুল গান্ধীও যেভাবে বিজেপি সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে তা কি লজ্জাজনক নয়, তাকি বিজেপি নেতাদের সম্ভ্রমের জায়গায়, বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গায় রাখতে পারে? বিজেপি-র প্রতি সাধারণ মানুষের বিমুখ হওয়ার এটাও একটা কারণ।বর্তমান এবং আসন্ন বিপর্যয়কে রোধ করতে হলে বিজেপি-র সাংগঠনিক চরিত্রে কিছু পরিবর্তন চাই নেতৃত্বের — হয়তো সেটা হচ্ছে। কিন্তু কিছু ব্যক্তির জায়গার পরিবর্তন নয়, দৃষ্টিভঙ্গীরও সংস্কার চাই। জণগণবিচ্ছিন্ন সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা বিজেপি সংগঠনকে দুর্বল করছে— দুর্বল করেছে মূল সঙ্ঘপরিবারকেও। সঙ্ঘের বৃহত্তম এবং মহত্তম সংগঠনেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এক ক্ষয়িষ্ণু আবহদের, তৈরি করছে কিনা দেখা দরকার ভাবা দরকার। হিন্দুত্ব আদর্শ নির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারনা কি রাজনৈতিক অবস্থার আনুকুল্য বা প্রতিকূলতা নির্ভর হবে না তা নিরপেক্ষভাবেই অবস্থান করবে তা ঠিক করতে হবে। অভিন্ন নাগরিক আইন (Uniform civil code) প্রচলন কি লক্ষ্য থাকবে? নতুন নেতৃত্ব নতুন করে এগুলি প্রত্যয়িত করবে কি? নতুন রাজনৈতিক সমীকরণই এই প্রশ্নগুলিকে সামনে আনছে। এগুলির দ্বিধাশূন্য উত্তর চাই না হলে কল্যাণ সিং, বাঘেলাদের স্রোত রুদ্ধ করা যাবে না। গণআন্দোলন কি গো-রক্ষার জন্যই হবে শুধু? ওই ধর্মীয় ঐতিহ্য বহনের জন্যই হবে শুধু? না প্রাত্যহিক জীবনচর্যাকে সাবলীল ও মর্যাদাপূর্ণ করতেও হবে? আশা করা যাবে নতুন নেতৃত্ব ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এই প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে যাবে না।

(লেখক বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের পদার্থ বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক)

স্কুলপাঠ্যে যৌনশিক্ষা অপ্রয়োজনীয়

(১ পাতার পর)

তার নাম হল 'বয়ঃসন্ধি শিক্ষা'। নাম যাই হোক না কেন, এর বিষয়বস্তু যে ভারতীয়ত্বের ঘোরতর বিরোধী তা স্পষ্ট হবার পরেই এ নিয়ে আন্দোলনের ঝড় ওঠে।

আন্দোলন চলাকালীন রাজ্যসভায় ২০০৭ সালের ৯ আগস্ট রাজ্যসভায় এ বিষয়ে একটি পিটিশান জমা পড়ে। সেখানে বলা হয়, মানবসম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রক গৃহীত এই ধরনের পাঠ্যসূচী যে কোনও সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের কাছে এক বড় আঘাত এবং বেদনাদায়ক।" সেইসঙ্গে এই আর্জিও জানানো হয়েছিল যে, আপাতত এই পাঠক্রমটি পড়ানো বন্ধ করা হোক। অবশেষে, বেঙ্কাইয়া নাইডু'র নেতৃত্বে রাজ্যসভার একটি প্যানেল গত ৯ জুন 'যৌনশিক্ষা অপ্রয়োজনীয়' বলে ঘোষণা করে এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি পরামর্শ কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রককে দিয়েছেন। পরামর্শগুলি এইরকম —

(১) স্কুল ছাত্রদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হোক-বিবাহের পূর্বে যে কোনও ধরনের যৌনকাজ অনৈতিক, কুরুচিকর এবং অস্বাস্থ্যকর।

(২) 'বয়ঃসন্ধির সময় শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এই পাঠ্যসূচীটিতে যে HIV, AIDS বা অন্য কোনও যৌন রোগ সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে তা মাধ্যমিকস্তরে বাদ দিয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে 'বায়োলজি' বিষয়ে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

(৩) পাঠ্যসূচীতে যাতে সাধু-সন্ত, আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং জাতীয় নায়কদের পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবনী থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যাতে বারংবার সেই সমস্ত জীবনীপাঠ করলে ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জানতে পারে।

মার্কিন ষড়যন্ত্রের নিন্দায় শঙ্কর রাচার্য

(১ পাতার পর)

সহ্য করব না।"

মূলত জয়েন্দ্র সরস্বতীর এই বক্তব্যের পর চাপে পড়েই পিছু হটে মনমোহন সরকার। গত ১২ জুন ইউ এস সি আই আর এফ প্রতিনিধিদের দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা দেবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও ভিসা না পাওয়ায় তাঁরা ভারতে আসতে পারলেন না।

রাজ্য রাজনীতি

নিজেকে বাঁচাতে বুদ্ধ -র দিল্লীর চরণে প্রণিপাত

নিশাকর সোম

"লালগড় একদিনের ঘটনা নয়। দীর্ঘ অপশাসনের ফল। সকলকে মাওবাদী না বলে বাস্তব দেখা উচিত। সরকারের টাকা পার্টি বা নেতার হাতে গেলে জনরোষ হবেই। হয় কাজ করুন, আর সামলাতে না পারলে গদি ছাড়ুন।" — সোনিয়া গান্ধী ।

"পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। রাজ্য সরকার দ্বিধা বিভক্ত। কোন পথে পদক্ষেপ, সেটাই ঠিক করতে পারছে না। ওদের দুটো অংশ দু'রকম কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি কী করবেন ঠিক করুন, সাহায্য করবো।" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম্।

উপরের উক্তি দুটি হল তাদের, যাদেরকে বিগত পাঁচ বছরে গদীতে থাকতে সাহায্য করে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভোগ করেছে। অজুহাত দিয়েছে "সাম্প্রদায়িক"- শক্তিকে রোখার।

বামফ্রন্টের সভায় শরিক দলগুলিও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে রাজ্যে প্রশাসন বলে তো কিছুই নেই-ই, খোদ মহাকরণে তাদের পাত্তা দিচ্ছেনা কেউ। কেন্দ্রের সাহায্য আর ঝাড়খন্ডের সহযোগিতা ছাড়া লালগড়ের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

বামফ্রন্টের সভায় মুখ্যমন্ত্রী এবং বিমান বসু দু'জনেই স্বীকার করেন তাঁদের কোনও লোক উপদ্রুত অঞ্চলে নেই। তারা আরও জানিয়েছেন, রাজ্যের প্রায় ২০টি থানা এলাকা মাওবাদীদের কব্জায় রয়েছে। নীচের তলার পুলিশকর্মীগণ উপদ্রুত এলাকায় যেতে কার্যত অস্বীকার করেছেন। ৩২ বছরের কুশাসনের কী চমৎকার ফল! বছরের পর বছর নেতারা টাকা লুটে প্রাসাদ করেছেন, বিত্ত বৈভবে ফুলে উঠেছেন। আর দরিদ্র জনগণ এমনকী দরিদ্র পার্টি কর্মীরাও বঞ্চিত থেকেছেন। তাই তাঁরা আজ মাওবাদী হয়ে শোধ তুলছে। সিপিএম মাওবাদীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার কথা বারবার বলেছিল। কিন্তু কোথায় গেলো রাজনৈতিক মোকাবিলা? রাজনৈতিক মোকাবিলা করার বিদ্যা-বুদ্ধি, বুদ্ধ - বিমান - বিনয়- নিরুপম - শ্যামল সুভাষদের নেই। আর মদন ঘোষ তো রাজনৈতিক 'নাদান'। চীনে গ্যাং অফ ফোর — দুষ্ট চতুষ্টয় ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম ষষ্ঠ দুষ্টদের রাহু গ্রাস হয়েছে। এই ষষ্ঠ দুষ্টের বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত রাজ্য কমিটির সভার বেশির ভাগ সদস্য তীব্র সমালোচনা করেছেন। বুদ্ধ দেবকে ব্যর্থ বলে অভিহিত করার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে "ভ্রান্ত কৌশল" অর্থাৎ' ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করাটাকে মুর্খামি বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিমান বসু রাজ্য পার্টির সম্পাদক হিসাবে ব্যর্থ — তাও প্রায় সকলে বলেছেন। বিমানবাবু এবং বিনয় কোঙার-এর বিভিন্ন উক্তি সম্পর্কে রাজ্য কমিটির সদস্যদের মত হল, এর ফলে পার্টির ভাবমূর্তিতে কালিমা লেপিত হয়েছে।

রাজ্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে রাজ্য কমিটির সদস্যদের অভিমত হল — বুদ্ধ দেবের প্রশাসন ব্যর্থ। দু'দিনের সভা ডাকা সম্পর্কে সমালোচনায় বলা হয়, "আসলে নেতাদের দোষ-ত্রুটি ঢাকবার জন্য মাত্র দু'দিন সভা করার ব্যবস্থা হয়েছে।" সভার দাবী মতো কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পর আবার সভা ডাকার সিদ্ধান্ত। উল্লেখ করা প্রয়োজন, তখন রাজ্যের পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হবে। লালগড়ে বহ্নি-উৎসবের পর আধা-সামরিকবাহিনীর অভিযানের ফলাফল রাজ্য-রাজনীতিতে দেখা যাবে।

এদিকে বামফ্রন্টের সভায় বুদ্ধ বাবু আসামীর কাঠগড়ায়। ক্ষিতি গোস্বামী বলেন, প্রশাসন আর বামফ্রন্টকে মানছেনা। মহাকরণের পুলিশও মন্ত্রীদের আর আগের মতো দেখেন না। বিরোধী নেতা পার্থ চ্যাটার্জি এলে তাঁকে ভাবি মুখ্যমন্ত্রীর মতো দেখা হয়। ক্ষিতিবাবুকে নন্দ ভট্টাচার্য, কিরণময় নন্দ সমর্থন করেন।

সিপিআই দলের রাজ্য কমিটির সভায় সিপিএম-এর দাদাগিরি সহ্য করে আর বামফ্রন্ট থাকার দরকার নেই, এ কথাও

সি পি এম নেতার বাড়ি ভাঙছে ক্ষুব্ধ জনতা।

উঠেছে। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে আর জনগণ দেখতে চাইছেনা। এই বক্তব্যও সিপিআই-এর রাজ্য পরিষদ-এর অধিকাংশ-এর মত। উল্লেখ করা প্রয়োজন গুরুদাস দাশগুপ্ত রাজ্যের ভ্রান্তনীতির বিরুদ্ধে একাধিক বার প্রকাশ্যে বক্তব্য প্রচার করেছিলেন।

এখন একটা কথা স্পষ্ট হল যে — তৃণমূল জোট ও মাওবাদীদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য দায়ী নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে জমি নীতি। এই নীতি নেওয়ার আগে রাজ্য পার্টি নেতৃত্বকে এবং জেলা নেতৃত্বকে না জানিয়ে বুদ্ধ বাবু কাজ করে চলেছিলেন।

এমনকী এক সময়ে রাজ্য পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মন্ত্রী গৌতম দেবকে বলতে হয়েছিল — "আমি কি এখন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আছি।" ৩২ বছর ধরে গ্রামের গরীব মানুষদের জন্য কিছু না করে টাটার মতো ধনীদের তোষণের রাজনীতি করে গ্রামের সমগ্র দরিদ্র মানুষ এমনকী পার্টির কর্মীরাও এই সরকারের বিরুদ্ধে চলে গেছেন। স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যাপারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ ব্যর্থ — গ্রামে কোনও স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই। এটিও গ্রামের মানুষকে বিরূপ করেছে। ছ'টাকা দামে যে চাল নির্বাচনে জেতার জন্য দেবার ব্যবস্থা হল সেটা কেন আগে দেওয়া হয়নি। ১০০ দিনের কাজের অর্থ নয়ছয় করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে পার্টির নেতাদের বিত্ত-বৈভব বেড়েছে, আর পাশাপাশি গরীবদের কোনও কর্মসংস্থান হয়নি — এটাও ক্ষোভের আগুন বাড়িয়েছে। তাইতো লালগড়ে পার্টির নেতার প্রাসাদ-এর মতো অট্টালিকা চূর্ণ করার অভিযান চলে। এ-যেন চেসে স্কু-হোনেকার-এর ঘটনা! লজ্জা করে না কমিউনিস্ট নামধারীদের। ধিক্ ধিক্।

বিগত মন্ত্রীসভার কান্তি বিশ্বাস যিনি অনিল বিশ্বাসের প্রিয়ভাজন (শোনা যায় আত্মীয়) তিনি স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা তছনছ করে দিয়েছেন। এরপর নতুন স্কুলমন্ত্রী পার্থ দে-কে ঠুঁটো জগন্নাথ করে কান্তি বিশ্বাসের মাতববরি স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে চালু করার চেষ্টা হয়েছে।

পার্টির সদস্যদের আচরণ সম্পর্কে আর এস পি এবং সিপিআই-এর অভিমত হল — তাঁরা যেন সামন্তবাদী প্রভু আর জনগণ যেন দাস। একথা সিপিএম-এর রাজ্য কমিটির বিবৃতিতে স্বীকার করে বলা হয়েছে —" পার্টির ছোট অংশের মধ্যে অকমিউনিস্ট সুলভ আচরণ দেখা গেছে।"

সিপিএম-এর পার্টি নেতৃত্ব-এর বিশ্বাসযোগ্যতা পার্টির মধ্যে নেই — বামফ্রন্ট-এ আছে অনাস্থা। সিপিএম-কে 'জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তাদের নেতাদের কাজের ফলে। পার্টিতে আওয়াজ উঠেছে — 'এ রাজ্যের পার্টির গর্বাচভদের

(এরপর ১৩ পাতায়)

অন্য রকম

কলমের প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ওদের জানা নেই ঈশ্বর আছে কি নেই। জানা নেই ঈশ্বর করুণাময় কিনা। ওরা শুধু জানে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতে। তাও মৌখিক নয়— লিখিত আকারে। প্রার্থনার উপযুক্ত প্রমাণ রেখে। এখানেই বিশেষত্ব ভক্তদের। সেইসঙ্গে ভগবানেরও। মন্দিরের দেওয়ালে সমস্যার কথা লিখে জানালেই, পরিত্রাণ মেলে হরেক সমস্যা থেকে। উদ্ধার পাওয়া যায় জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝাট থেকে।

রাজস্থানের কোটা শহর। এখানেই রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের মন্দির। যেখানে ভক্তদের বড় অংশ শুধুই ছাত্র-ছাত্রী। কেউ জয়েন্টের। কেউ আই টি-র। কারও রয়েছে ভর্তির সমস্যা। কারও অন্য কিছু। সমস্যা যাই থাকনা কেন, মন্দিরের দেওয়ালে লিখে জানালেই মেলে সমাধান। এই বিশ্বাসেই কাতারে কাতারে উচ্চ শিক্ষিতরা আসেন প্রার্থনা জানাতে।

মনের বাসনা পূর্ণ হলেও, আবার আসেন তারা। সেই আসা তখন কোনও কিছু চাওয়ার জন্য নয়। ভগবান যেন আরও আপন হয়ে ওঠে তখন। মন্দির রাধা-কৃষ্ণ-র হলেও, ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পড়াশোনার সমস্যা নিয়েই হাজির হয়। এটাই এখানকার চল।

শুধু নিজের কথা লিখে চলে যান না তারা। অন্যের কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা থাকলে, কিম্বা পারিবারিক সমস্যা থাকলে অনেক সহৃদয় ছাত্র-ছাত্রী তার পাশে দাঁড়িয়েছেন — এমন ঘটনাও দেখা গেছে এখানে। বিশ্বাসে বন্ধুত্বও মেলে। মেলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য। আর এইসব কিছুরই মূল মাধ্যম মন্দিরের দেওয়াল। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর যেন ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা নিবেদন করে।

২০০৩ সালে গড়ে ওঠা এই মন্দির অল্প সময়ের মধ্যেই ভক্তদের বিশ্বাসস্থলে পরিণত। রাজস্থানের কোটা শহর কলকাতার বেলঘড়িয়ার মতোই 'মেসনগরী'। যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের বাসই বেশি। তারাই আসেন এখানে। প্রার্থনা জানান ভগবানের কাছে। কিন্তু তা লিখিতভাবে। এটাই মন্দিরের পরম্পরা।

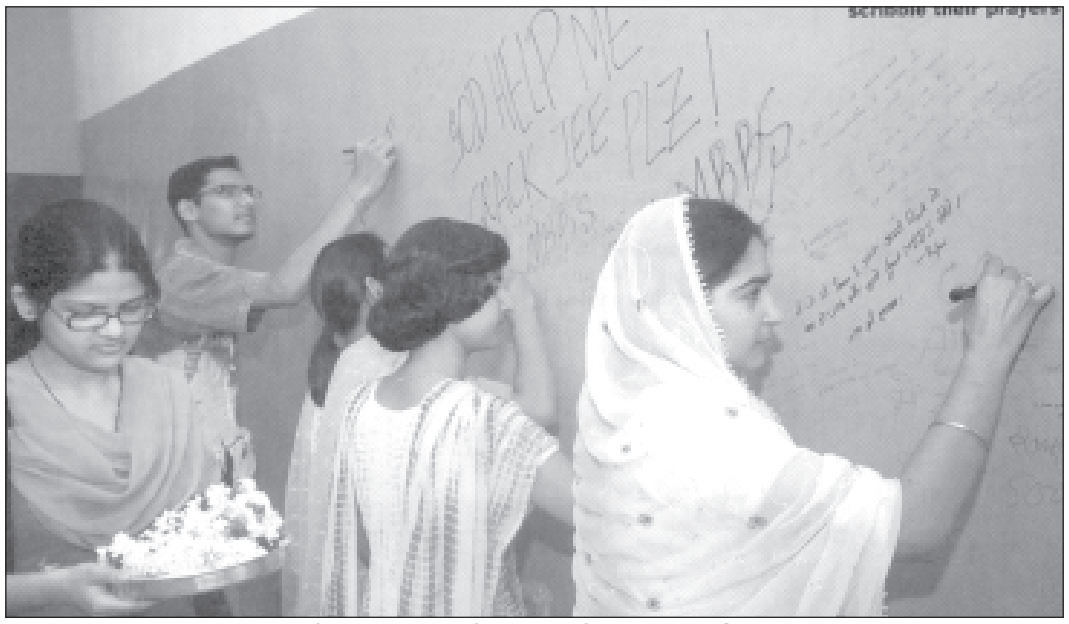

মন্দিরের দেওয়ালে নিজের কথা লিখছেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

গঙ্গাভাঙন নিয়ে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই

তরুণ কুমার পণ্ডিত ঃ মালদা ।। প্রতি বছর বর্ষার মুখে নদী ভাঙন এক ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে মালদা জেলার মানচিত্রে স্থান দখল করে নিয়েছে। এবছর বর্ষা এখন না আসলেও মালদার কালিয়াচক ৩ নং ব্লক এবং মানিকচক ব্লকে গঙ্গার বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়নি। এলাকার বাসিন্দারা নদী ভাঙনের আশঙ্কায় দিন গুণতে আরম্ভ করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বর্ষার মুখে এখনও বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হল না। এর ওপর এলাকার দুস্কৃতীরা প্রকাশ্যেই বাঁধের মাটি ও বোল্ডার চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে বাঁধ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কথায় আছে, 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়'। গত বছর গঙ্গার ভাঙনে এইসব এলাকার বহু মানুষের চাষের জমি, ঘর-বাড়ি, নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। গতবছর কালিয়াচক ৩ নং ব্লকের বীরনগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত ও মানিকচক ব্লকের ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামগুলি ভাঙনের কবলে পরেছিল। এবারও এই গ্রামগুলি একই অবস্থায় রয়েছে। বীর নগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আতাটোলা, সিমুলতলা ও বিহারিটোলা গ্রামের ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ গঙ্গা ভাঙনের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। একই ভাবে ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর, শিবনটোলা, ব্রহ্মটোলা, কার্তিক টোলা এবং সোনপুর এলাকাগুলির মানুষরাও ভাঙনের আশঙ্কায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে উঁচু বাঁধে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নিয়েছে। গত বছরও এইসব এলাকাগুলিতে ব্যাপক ভাঙন হয়েছিল। পর পর ভাঙন এই সব এলাকার মানুষরা দিশেহারা। ডোমহাটের বাসিন্দা রেণুকা মণ্ডল, সনাতন মণ্ডল, সুভাষ মণ্ডলেরা বলেন, গতবার ভাঙনে তাদের বাড়ি-ঘর চাষের জমি সব গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে। এখন কেউ রাস্তার ধারে, কেউ অন্যের আম বাগানে যাযাবরের মতো জীবন যাপন করছি। পঞ্চায়েত ও প্রশাসন থেকে আমরা কোনও সাহায্য পাইনি।

এদিকে ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শ্রমিকের অভাবে ডোমহাটে কাজ করা যায়নি। তাছাড়া কালিয়াচক ৩ নং ব্লকে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করার আগেই দুস্কৃতীরা তোলা আদায়ের চেষ্টা করছে। এইসব দুস্কৃতীদের বেশির ভাগ মুসলিম সম্প্রদায়ের। এর ফলে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। মুষ্টিমেয় কিছু দুষ্কৃতীর জন্য হাজার হাজার মানুষ আগামী দিনে কষ্ট ভোগ করবে। গঙ্গা অ্যাকশন কমিটির সম্পাদক বলেন, এলাকার বাঁধের অবস্থা খুব খারাপ, গঙ্গার জল যেভাবে বাড়ছে তাতে এবছর যে কোনও সময়ে বাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হতে পারে। কালিয়াচক ৩ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মণ্ডল এবং মানিকচক-এর বিধায়ক অসীমা চৌধুরী ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে-এর জন্য দায়ী করেছেন। মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির রেহেনা বিবি বলেন, প্রতি বছর যেভাবে নদীভাঙন হচ্ছে, তাতে আগামী দিনে ডোমহাট এলাকাটিই গঙ্গায় তলিয়ে যাবে। এলাকার মানুষদের বক্তব্য, ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন এইভাবে একে অপরের ওপর দোষারোপ করে ও কথা কাটাকাটি করে চলেছে, কিন্তু নদী ভাঙনের মূল সমস্যার কেউ সমাধান করছে না। শেষ পর্যন্ত বর্ষা এলে আমাদের ভাঙনের মধ্যে পরে সর্বস্বান্ত হতে হবে। একমাত্র ঈশ্বরের ওপর ভরসা করেই এলাকার মানুষরা দিন যাপন করছেন।

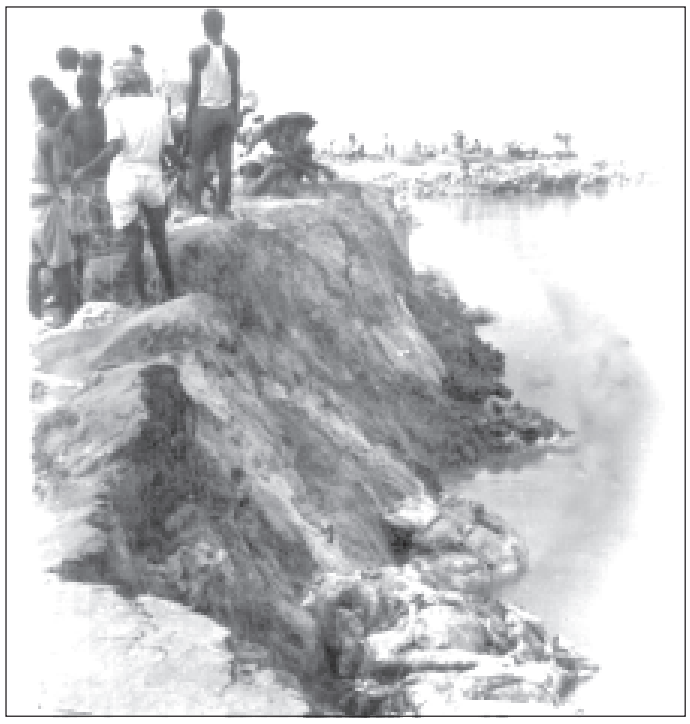

গৌড়ের রামকেলী মেলা জমজমাট প্রশাসন উদাসীন

তরুণ কুমার পণ্ডিত ঃ মালদা ।। প্রতি বছরের মতো এই বছরেও গত ১৫ জুন জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন থেকে ৭ দিনের জন্য শুরু হল মালদার রামকেলী মেলা। ঐতিহাসিক গৌড়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন উপলক্ষে এই রামকেলী মেলা শুরু হয়। আনুমানিক ৫০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই মেলা হয়ে চলেছে। এই মেলাতে দেশ-বিদেশ থেকে বহু ভক্ত ও বৈষ্ণবগণ, সাধু-সন্ত সমবেত হয়। কিন্তু মালদা জেলার এত বড় হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র এবং মেলা চললেও হাজার হাজার তীর্থযাত্রীদের জন্য সরকারিভাবে পরিষেবার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। তীর্থযাত্রীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা, শৌচালয়, পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা এবং ঔষধপত্রের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। তার ওপর সুস্থানী মোড় থেকে পিয়াসবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা যাত্রীদের দুর্ভোগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। মেলার প্রথম দিন সবচেয়ে বেশি ভীড় লক্ষ্য করা গেছে। কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যাত্রীদের জন্য রাতে ও দিনে খিচুরী খাওয়ার ব্যবস্থা করলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। কোচবিহার শিলিগুড়ির মতো এলাকা থেকে তো বটেই, অসম, বিহার, এমনকী বাংলাদেশ থেকেও অনেক তীর্থযাত্রী এই মেলাতে এসেছে। তাদের মধ্যে একাংশ গৌড়েশ্বরী মন্দিরে পিন্ড দান করতে কিম্বা কীর্তন বাউল গান শুনতেও সমবেত হয়েছিল। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ২০ মিনিট হেঁটে গাড়ি ধরে ১ ঘন্টা পর মালদা সদর হাসপাতালে পৌঁছাতে পারবে। মালদার বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ থেকে এই মেলার জন্য কোনও প্রকার সহযোগিতা বা পরিষেবার ব্যবস্থা করেনি। মেলাতে আগুন লাগলে দমকলের ব্যবস্থা নেই। যাত্রীদের অভিযোগ, তারা জল, থাকার ব্যবস্থা, শৌচালয় পাচ্ছে না।

সম্প্রদায় বিশেষের মেলা হলে এম এল এ এম পি মন্ত্রী মহল থেকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীক্ষার পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে রামকেলী গ্রামের তমাল বৃক্ষের তলায় অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় থেকেই তার পদচিহ্ন এখানে আছে। এছাড়া আছে তৎকালীন গৌড় সুলতান হোসেন সাহেবের প্রধান অমাত্য সনাতন ও শ্রীরূপ সেবিত মদন মোহন মন্দির। স্থানীয় মানুষরা এই মেলা থেকে আর্থিক দিক দিয়ে উপকৃত হয়। আম সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি করে। ইসকন, রামকেলী সংস্কার সমিতি, মদনমোহন মন্দির কমিটি ও গৌড়ীয় মঠের মতো ধর্মীয় সংগঠনগুলি একদিকে যেমন যাত্রীদের আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করে তেমনি কাঞ্চনতার সাঁই সমিতি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের যৌথ প্রচেষ্টায় মেলায় সাফাই অভিযান চালানো হয় এবং মেলার পরিবেশকে দূষণ মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা হয়ে থাকে।

যজ্ঞের মাধ্যমে হিন্দু ছেলের সঙ্গে মুসলিম মেয়ের বিয়ে

সংবাদদাতা ।। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার রুইডাঙ্গা গ্রামের ধনেন্দ্র চন্দ্র দাসের ছোট ছেলে কর্মসূত্রে অসমের গুয়াহাটিতে থাকতেন। সেখানে সহায় সম্বলহীন এক মুসলিম মায়ের একমাত্র কন্যার সাথে তার পরিচয় এবং পরে তারা পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়।

গত ১৪ জুন রবিবার ছেলের বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং গ্রামের লোকজনের উপস্থিতিতে, কোচবিহার জেলা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গোরক্ষা সমিতির সম্পাদক সুশীল কুমার মজুমদার হোম যজ্ঞের মাধ্যমে শুদ্ধি করে মেয়েটির সাথে ছেলেটির বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে দিলে উপস্থিত সবার মধ্যে খুশির হাওয়া বইতে থাকে। মেয়েটিও হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে খুবই আনন্দিত। তার নামকরণ করা হয় রুমা দাস। ছেলের নাম গনেশ দাস।

এই বৈবাহিক যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন হরিপদ পাল, নিরঞ্জন কুণ্ডু, অনিল দেবশর্মা, বীরেন্দ্র চন্দ্র দে, নিরঞ্জন কুণ্ডু প্রমুখ।

গোরু-পাচারের জন্য আমন ধানের জমি তৈরিতে চাষিরা বিপাকে

সংবাদদাতা ।। কোচবিহার জেলা থেকে ব্যাপক হারে গোরু বলদ বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমন চাষের জমি তৈরির কাজে চাষিরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা গ্রামগুলিতে এই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। সীমান্ত এলাকার চাষিরা বলেন, বাংলাদেশে বলদের ব্যাপক চাহিদা থাকায় তা বেশি মাত্রায় পাচার হচ্ছে। আর এপারে বলদের আকাল দেখা দিয়েছে। যেভাবে বলদ পাচার চলছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে চাষীর ঘরে আর চাষের জন্য বলদ থাকবে না। গোরু পাচার রুখতে অবিলম্বে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

কোচবিহার জেলায় প্রায় দু'লক্ষ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়। এখন বীজতলা তৈরির কাজ চলছে। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমি তৈরি করে বীজ বোনার কাজ শুরু হবে। কিন্তু জমি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় হালের বলদ না পাওয়ায় চাষীরা সমস্যায় পড়েছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদে পাওয়ার টিলার থেকে শুরু করে অনেক অত্যাধুনিক যন্ত্র বেরিয়েছে। কিন্তু গ্রামগঞ্জের অনেক জায়গাতেই সেই সুবিধা পৌঁছায়নি। জেলার সীমান্তের গ্রামগুলিতে পুরানো পদ্ধতিতেই চাষাবাদ চলছে। তাছাড়া পাওয়ার টিলার দিয়ে জমি চাষ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের নেই। হাল-বলদ দিয়েই বেশিরভাগ জমি তৈরি করা হয়।

চাষিরা বলেন, একদিকে সার বীজ ও কৃষিজ উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, তার উপর এপার থেকে ব্যাপকহারে বলদ বাংলাদেশে পাচার হওয়ায় চাষ করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে এলাকায় দেশি গরুর সংখ্যা একেবারে কমে গিয়েছে। এখন হরিয়ানা থেকে গোরু এনে পাচার চলছে। এর সঙ্গে দেশি বলদও পাচার হওয়ায় বাজারে দাম প্রচণ্ড চড়ে গিয়েছে। আগে একজোড়া বলদ ১০-১২ হাজার টাকায় মিলত। এখন তার দাম হয়েছে ১৬-১৮ হাজার টাকা। এনিয়ে গ্রামেগঞ্জের পঞ্চায়েত প্রধানরাও উদ্বিগ্ন। দিনহাটার চৌধুরিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জগৎ চন্দ্র বর্মন বলেন, এখন এলাকায় দেশী গোরু ও বলদ চোখেই পড়ে না। পাচার বেড়ে যাওয়ায় এই সমস্যা হয়েছে। বি এস এফের কোচবিহার সেক্টরের ডি আই জি বিজয়সিং সিকরওয়ার বলেন, পাচার রুখতে সীমান্তে কড়া নজরদারি চলছে। প্রায় দিনই গোরু, বলদ আটক করা হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা, সীমান্ত প্রহরী ও চোরাচালানকারীদের যোগসাজসেই বাংলাদেশ গোরু-পাচার চলছে।

উত্তর কাছাড়ে জাতিদাঙ্গা অব্যাহত

সংবাদদাতা ।। গুয়াহাটি থেকে লোকসভায় নবনির্বাচিত বিজেপি সাংসদ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিজয়া চক্রবর্তী অসম রাজ্য সরকারের কড়া সমালোচনা করলেন। গত ১৫ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতী চক্রবর্তী অভিযোগ করেন যে, আধা সামরিক বাহিনী অভিযানে নামা সত্ত্বেও রাজ্যের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় জাতিগোষ্ঠীগত সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। শিশু ও মহিলাদের রেহাই দিচ্ছে না সন্ত্রাসবাদীরা। অনেক গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বছরভর চলছে এই জাতিগোষ্ঠীগত দাঙ্গা। শুধু অভিযান নয়, উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে করতে হবে বলে শ্রীমতী চক্রবর্তী দাবি জানান। জাতীয় নাগরিক পঞ্জীয়ণ সূচীর ভিত্তিতে সারা দেশের সঙ্গে অসমেও নাগরিক পরিচয় পত্র দিতে হবে। তবে তার আগে অবশ্যই জাতীয় নাগরিক সূচী 'আপ-টু-ডেট' করতে হবে।

শ্রীমতী চক্রবর্তী অসমে এন টি সি (National Textile Corporation)-র কারখানা নীলামে বিক্রির সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সারা দেশে আরও আটটি এরকম মিল রয়েছে, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র অসমের এন টি সি-র মিলটিই বা বিক্রি করা হবে কেন? তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের জলসম্পদকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ। তবে শ্রীমতী চক্রবর্তী বলেন, তাঁর সাংসদ থাকাকালীন তিনি গুয়াহাটির নিকাশী ব্যবস্থা ও পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন।

ঝাড়খণ্ড কে দুর্বল করে দিচ্ছে একের পর এক মাওবাদী আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ২০০০ সালের ২৫ নভেম্বর পৃথক রাজ্য হিসাবে গড়ে ওঠে ঝাড়খন্ড। সেই শুরু থেকেই মাওবাদী সমস্যা এই রাজ্যে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন কারণে একাধিকবার মাওবাদী আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, প্রায় প্রতি মাসেই রাজ্যের কোনও না কোনও অঞ্চ লে মাওবাদী আক্রমণের খবর সামনে এসেছে। মাওবাদীদের হিংসাত্মক ঘটনায় একদিকে যেমন বহু পুলিশ কর্মীর প্রাণ গেছে, তেমনই মাওবাদী নিশানায় বাদ যায়নি সাধারণ মানুষও। মাওবাদী উপদ্রবে সেদিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে সাধারণ মানুষেরই। রাজ্যের বেশিরভাগ জেলাতেই গ্রামবাসীরা আতঙ্কে র মধ্যে দিন কাটান। কখন মাওবাদী নিশানার শিকার হতে হবে — এই ভয়ই তাড়া করে তাদের। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনায় ৭৬০ জন মানুষের প্রাণনাশ হয়েছে। যদিও বেসরকারি মতে অঙ্ক টা আরও বেশি। মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ৩৩৪ জন পুলিশ কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন।

মাওবাদীদেরও একটা বড় অংশ বিভিন্ন ঘটনায় মারা গেছে। ঝাড়খন্ড প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের ও কেন্দ্রের টাকার একটা বড় অংশ খরচ হয়ে যায় মাওবাদী মোকাবিলায়। এই অবধি কেন্দ্রের ২৯৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে, মাওবাদী সমস্যার মোকাবিলাতে। রাজ্যেরও কম টাকা যায়নি। ৩০০ কোটির ওপর খরচ হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এত টাকা খরচের পরেও, মাওবাদী সমস্যার সমাধানে প্রশাসন পুরোপুরি সফল নয়। উল্টে যেখানে শুরুর

দিকে রাজ্যের আট-দশ জেলায় মাওবাদীদের প্রভাব বেশি ছিল, আজ সেখানে রাজ্যের ২৪টির মধ্যে ২২ জেলাই মাওবাদী অধ্যুষিত।

লোকসভা ভোটের সময়ও মাওবাদীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি রাজ্য। তাছাড়া বছরের শুরুর দিক থেকেই বড় ধরনের মাওবাদী হামলার ঘটনাও দেখা গেছে। ১৭ জানুয়ারি লাতেহারের মনিকা থানায় মাইন বিস্ফোরণ ঘটায় তারা। যাতে বেশ কয়েকজন পুলিশের মৃত্যু হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের ২৫ তারিখে এক ট্রেনের ওপর হামলা চালায় মাওবাদীরা। এবছর এপ্রিল মাসে মাওবাদী আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে সর্বাধিক। ২ এপ্রিল এক বিজেপি নেতার বাড়িসহ স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও স্কুলে হামলা চালায় মাওবাদীরা। এর পরের দিনই নিরাপত্তারক্ষীদের গাড়িতে আক্রমণ করে তারা। ওই সময় গাড়িতে কোনও কর্মী না থাকায় বড় ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। এছাড়া এবছরের এপ্রিলের ৫, ৭, ১০ তারিখে মাওবাদীরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায়। যাতে নিরাপত্তারক্ষীদেরই বেশি বিপদের মুখে পড়তে হয়। মে মাসেও রাজ্যে মাওবাদীরা দাপিয়ে বেড়িয়েছে। ১৫, ১৬, ১৭ মে রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চ লে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটায় তারা। চলতি মাসের শুরুতেই বোকারো জেলায় এক ব্যাঙ্কে আক্রমণ করে মাওবাদীরা। ওই ঘটনায় ১২ জন জওয়ান নিহত হয়।

ওইদিন পৃথক দুই ঘটনায় ১৪ জন নিরীহ ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়। চলতি মাসে এটি ছিল মাওবাদীদের সবথেকে বড় আক্রমণ। এই দুদিন আগেও পশ্চি ম সিংভূম জেলাতে মাওবাদীদের হামলার ঘটনা ঘটে। ঝাড়খন্ডের ক্ষেত্রে মাওবাদী সমস্যায় ধীরে ধীরে রাজ্যকে দুর্বল করে তুলছে। ঠেলে দিচ্ছে বিপর্যয়ের মুখে।

গত পাঁচ বছরে রাজ্যে মাওবাদীদের হিংসাত্মক ঘটনার একটি চিত্র এইরকম ঃ (সারণী দ্রষ্টব্য)

তারিখ	ঘটনার স্থান
২০০১	
২৪ সেপ্টেম্বর	হাজারিবাগ
৪ অক্টোবর	গরয়া
৩১ অক্টোবর	ধানবাদ
২০০২	
২ ফেব্রুয়ারি	ছাতরা
৭ মে	কোডরমা
২০ নভেম্বর	লাতেহার
২০ ডিসেম্বর	চাইবাসা
২০০৩	
১০ ফেব্রুয়ারি	লাতেহার
৪ জুন	বার্মো
৩০ জুন	লাতেহার ও গুমলা
২০০৪	
৭ এপ্রিল	বালিয়া
২২ জুন	রানিয়া, রাঁচি
২০০৫	
৩ ফেব্রুয়ারি	ছাতারপুর, পালামৌ
২৩ ফেব্রুয়ারি	ঝুমরা, বোকারো
৬ জুলাই	গরয়া
২০০৬	
১ জুন	করমপদা, চাইবাসা
২০০৭	
৪ মার্চ	জামশেদপুর
২০০৪	
২৭ এপ্রিল	দুমকা
৮ মে	গিরিডি
২০ মে	হাজারিবাগ
৩০ জুন	হাজারিবাগ

কর্ণাটকে বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেশজুড়ে ব্যাপক আর্থিক মন্দার কোপে দক্ষিণী রাজ্য কর্ণাটকও পড়েছে। রাজস্ব আদায় কম হয়েছে। এই অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর সঙ্গে দেখা করে শিগগিরই কেন্দ্রের সাহায্য চাইবেন বলে জানা গেছে।

গত ৩১ মে রাজ্যে বিজেপি সরকারের প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক জনসভা আয়োজিত হয়। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী ইয়েদুরাপ্পা 'বিকাশ (উন্নয়ণ) সংকল্প উৎসব'-এর কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানিয়েছেন রাজ্য থেকে নবনির্বাচিত ২৮ জন সাংসদ জুন মাসেই রাজধানী দিল্লীতে মিলিত হয়ে ২/৩ দিন ধরে রাজ্যের উন্নয়ণের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন। এবং সেখানেই তারা রাজ্যের যে সকল উন্নয়ণ প্রকল্প কেন্দ্রীয় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে তা পাস করানোর জন্য একযোগে দরবার করবেন। এ ছাড়া কর্ণাটক থেকে যে চারজন সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাদেরকে রাজ্যের উন্নয়নের দাবিতে সামিল করতে চান ইয়েদুরাপ্পা। তিনি আশা করেন রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা সহায়তা করবেন। তাহলে রাজ্যের জন্য

ইয়েদুরাপ্পা।

কেন্দ্রের আর্থিক প্যাকেজ অনুমোদন পেতেও সুবিধা হবে। রাজ্যের মন্ত্রীরা হলেন---এস এম কৃষ্ণা (বিদেশমন্ত্রী), আইন ও বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী বীরাপ্পা মইলি, শ্রম ও বিনিয়োগ মন্ত্রী মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রেল দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কে এইচ মুনিয়াপ্পা।

এখানে উল্লেখ্য, রাজ্যের সংসদীয় আসন সংখ্যা হল ২৮টি। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে কর্ণাটক থেকে বিজেপি-১৯, কংগ্রেস-৬ এবং জে ডি এস তিনটি আসনে জয়লাভ করেছে। রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি, জৈব প্রযুক্তি, শিল্প-কারখানা এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফলে গত ছয়মাসে জি ডি পি কমেছে।

তবে ইয়েদুরাপ্পা আশা প্রকাশ করেছেন, কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার রাজধানী ব্যাঙ্গালোর সহ অন্যত্রও উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো নির্মাণে সাহায্য করবেন। বর্ষার মরসুমের অব্যবহিত পরেই রাজ্যে এক বৈশ্বিক বিনিয়োগকারী সম্মেলনেরও ব্যবস্থা করবে রাজ্যের বিজেপি সরকার। এখানে পর্যবেক্ষক ও ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান যে, ইয়েদুরাপ্পাও কর্ণাটকে গুজরাটের ধাঁচের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও মডেলকে প্রয়োগ করতে চলেছেন।

গুজরাটে ১১টি শিল্পনগরী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গুজরাট সরকার রাজ্যের আরও এগারোটি শহরের নাম কেন্দ্রের কাছে পাঠাল। এই শহরগুলি আদতে শিল্পাঞ্চ ল। কেন্দ্র সরকার জওহরলাল নেহরু ন্যাশন্যাল আরবান রিনিউল মিশন (JNNURM)-প্রকল্পের অধীনে দেশের বিভিন্ন শহরকে আরও উন্নত করার কর্মসূচী নিয়েছে। গুজরাটের ওই এগারোটি শহরের মধ্যে অঙ্ক লেশ্বর, জামনগর, ভারুচ, আনন্দ ও মেহসানা প্রভৃতি পাঁচটি শহর দিল্লী-মুম্বাই ফ্রেট করিডরের মধ্যেই পড়ে। সুরাট, রাজকোট, আমেদাবাদ, বরোদা এবং পোরবন্দর ইতিমধ্যেই ওই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অধীনে সংযুক্ত হয়েছে। সরকার শহরগুলোর উন্নয়ণের জন্য কিছু পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে। গত ফেব্রুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ৬৩টি প্রকল্পে কেন্দ্রের অনুমোদন সাপেক্ষে ৪,৭৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই বরাদ্দ বাদে আরও ২,০২৬ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্য শহরের উন্নয়ণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে গুজরাট সরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করতে পারছে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিজেই অসুস্থ

।। নবকুমার ভট্টাচার্য।।

ভারতবর্ষের সংবিধানে 'জীবন ধারণের অধিকার' মৌলিক অধিকারের তালিকাভুক্ত হলেও স্বাস্থ্য বা রোগ চিকিৎসার অধিকারের স্থান হয়নি। কেন্দ্র নানা খাতে টাকা যোগালেও স্বাস্থ্য কিন্তু রাজ্যের তালিকাভুক্ত একটি বিষয় এবং সবার নীচে তার স্থিতি। মন্ত্রীমণ্ডলী নির্বাচনের সময় স্বরাষ্ট্র, অর্থ, কৃষি, গ্রামোন্নয়ণ পঞ্চায়েত পর্যটন — এসব ছাড়িয়ে একেকোণে পড়ে থাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবসম্পদ উন্নয়ণ সূচকের নিরীখে ১৮২টি দেশের মধ্যে আমাদের দেশের স্থান ১২৬ নম্বরে। এই সংখ্যায় শ্রীলঙ্কার নীচে ও পাকিস্তানের ওপরে। তবুও স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ক্রমশ কমছে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় তা ছিল মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-র ৪.৯৮ শতাংশ, বর্তমানে তা ১.০২ শতাংশ। ২০০৬ সালে চতুর্দশ লোকসভায় ইউপিএ-র প্রতিশ্রুতি ছিল স্বাস্থ্য বরাদ্দ বাড়িয়ে জিডিপি অন্তত ৩ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হবে।

স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও দেশে আজ দেড় কোটি যক্ষা রোগী। যার মধ্যে বছরে ৫ লক্ষ মারা যান — যা বিশ্বে প্রথম। পাঁচ বছরের নীচে শিশুদের মধ্যে প্রতিবছর ৫৫ লক্ষ পেটের অসুখে ভোগে এবং ১০ লক্ষ প্রতিবছর মারা যায় — এতেও আমরা বিশ্বে প্রথম। শিশুদের মধ্যে রক্তপ্লতা ও অপুষ্টির পরিমাণ ৭৪ শতাংশ। প্রসূতি মেয়েদের ৬০ শতাংশ অ্যানিমিয়ায় ভুগছেন। ম্যালেরিয়ায় বার্ষিক মৃত্যুহার ২৫ হাজার। কুষ্ঠ রোগী আছেন ৪০ লক্ষ, বিশ্বে প্রথম ৩৫ লক্ষ অন্ধ মানুষ বাস করেন এই দেশে, যাদের অনেকেই অন্ধ হয়েছেন ছানি কাটাতে না পেরে। রিউম্যাটিক হৃদরোগী ৬০ লক্ষ, অন্যান্য অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছেন ২৫ কোটি মানুষ। ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, এনকেফেলাইটিস — এইসব মশকবাহিত রোগ এবং কলেরা, ডায়েরিয়াসহ নানা আন্ত্রিক রোগে বছরে ১২ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছেন আমাদের দেশে। হেপাটাইটিস বি' ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ইতিমধ্যে আমাদের দেশেও তথাকথিত 'লাইফ স্টাইল ডিজিজেস' জাঁকিয়ে বসেছে। উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ, হৃদরোগ, মানসিক চাপজনিত অসুস্থতা ইত্যাদির প্রকোপও এদেশে খুব দ্রুত মাত্রায় বাড়ছে।

দেশের অবস্থা এরকম হলে, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কেমন হবে — তা সহজেই অনুমেয়। ২০০১ সালের ১২ নভেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করতে এসে রাজ্যের ডাক্তার স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছিলেন, এই রাজ্যে হাসপাতালের বাড়ি অনেক হয়েছে, হাসপাতাল হয়নি।' হবে কি করে? স্বাস্থ্য বিষয়ে এ রাজ্যে পার্ট টাইম মন্ত্রী। রাজ্যের জি ডি পি-র মাত্র ০.৮৭ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ। রাজ্যে ৩.২ গ্রামে একজন চিকিৎসক। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছতে একজন গ্রামীণ মানুষকে গড়ে ৪ কিলোমিটার হাঁটতে হয়। শিশুদের রক্তাল্পতার আধিক্যে ২৫টি প্রধান রাজ্যের মধ্যে এই রাজ্য ১৯ তম স্থানে। তিন বছরের নীচে গ্রামে অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় ভুগছে এমন শিশুর সংখ্যা রাজ্যে ৮২ শতাংশ।

দেশের মধ্যে এই রাজ্যে ম্যালেরিয়ায় মৃতের হার দ্বিতীয় সর্বাধিক। ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া প্রভৃতিতে এরাজ্য সামনের সারিতে। শিশু মৃত্যুর হারেও পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। 'জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা রিপোর্ট' ২০০৮ থেকে জানা যাচ্ছে, সন্তান জন্ম সময়ে আজও পশ্চিমবঙ্গের বহু মা ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। প্রতি ৫ জন নবজাত শিশুর মধ্যে ২ জন মাত্র হাসপাতালে, নার্সিংহোমে বা কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জন্মায়। অবশিষ্ট ৩ জনের মধ্যে ৯০ শতাংশ কোনও ডাক্তার, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাহায্য পায় না। ফলে রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হারও বেশি। ০-১ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি ২১ শিশুতে ১ জন। আর ০-৫ বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি ১৭ শিশুতে ১ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) সুপারিশ রয়েছে প্রতি ৩০০ জনের চিকিৎসার জন্য একটি বেড। কিন্তু এইরাজ্যে ১১৫০ জন প্রতি একটি বেড। জাতীয় গড় যদিও প্রতি ৯০০ জন প্রতি ১টি বেড।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি আস্থা নেই বলেই চোখের চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে কিউবায় যেতে হয়েছিল। সুভাষ চক্রবর্তী বাইপাস সার্জারি করিয়েছেন দিল্লীতে এস কর্টিস হাসপাতালে। শ্যামল চক্রবর্তীকে চিকিৎসার জন্য যেতে হয়েছিল ভিন রাজ্যে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেও অন্য রাজ্যে চিকিৎসার জন্য যান। এই হচ্ছে এই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এবং চিকিৎসার দক্ষতার প্রতি শাসকদলের শীর্ষ নেতাদের আস্থার প্রকাশ। এ রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রেখে অবহেলা ও গাফিলতিতে জীবন দিতে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটি স্পিকার অনিল মুখার্জিকে। এর পরেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিয়ম করে বিবৃতি দেন যে, রাজ্যে ৭০ শতাংশ মানুষ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা পান। শহরে যেটুকু পরিষেবা সরকারি বা বেসরকারি স্তরে রয়েছে কিন্তু গ্রামে নৈব নৈব চ। স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও ডাক্তার নেই আবার ডাক্তার থাকলেও ঔষধ থাকে না। সরকার ঘোষণা করল, ডাক্তারদের গ্রামে যেতে হবে। সদ্য পাশ করা যুবকেরা কেউ কেউ গরীব মানুষের সেবা করবেন এই স্বপ্ন নিয়ে গ্রামে গিয়ে দেখলেন — সরকারি দলের স্বাস্থ্য পরিষেবার আসল রূপ। সর্বত্র পঞ্চায়েত অথবা পার্টির নেতাদের মাতব্বরি। ঔষধ, সেলাইন সব পার্টির বাবুদের অধীনে। তারা ডাক্তারবাবুকে জগন্নাথ সাজিয়ে রেখে সেগুলি খোলা বাজারে বিক্রি করেন। ডাক্তারবাবু-এর প্রতিবাদ করলে তাকে নিগ্রহ করা হয়। এজন্য শহরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিছু ডাক্তার থাকলেও, গ্রামের অবস্থা শোচনীয়। শহর ও গ্রামীণ হাসপাতালগুলি আজ দুর্নীতির চক্রকেন্দ্র। সরকারি পরিষেবায় এত দুর্নীতি এত অপদার্থতা — তাই স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে মানুষের আজ আর ভরসা নেই এরাজ্যের কোনও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতি।

মানুষ আজ তাই দৌড়াচ্ছেন দক্ষিণে কিংবা পশ্চিমে। গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ১৯৯৫ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ৭০১ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট তৈরি করে রাজ্য সরকার ঠিক করেছিল জেলা, মহকুমা, স্টেট জেনারেল, গ্রামীণ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলে গোটা রাজ্যে ২১৪টি হাসপাতালকে এই প্রকল্পের আওতায় আনবে। বিশ্বব্যাঙ্ক বলেছিল, ঋণের টাকার ৪০ ভাগ খরচ হবে ঘর-বাড়ি তৈরিতে, ৩০ ভাগ যন্ত্রপাতি কেনা হবে, ১৫ ভাগ টাকা বরাদ্দ করতে হবে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং বাকি ১৫ ভাগ টাকা চিকিৎসা পরিষেবায় খরচ করতে হবে। এইসব হাসপাতালে আধুনিক যেসব যন্ত্রপাতি কেনা হবে, যেখান থেকে পরিষেবার বিনিময়ে টাকা তুলে ঋণ শোধ করতে হবে। এর ফল স্বরূপ ১৯৯২ সাল থেকেই রাজ্য সরকার সরকারি হাসপাতালে পরিষেবার উপর বিভিন্ন চার্জ ধার্য করে। যদিও এখনও চিকিৎসার খরচের রাজ্য সরকার বহন করছেন ১৮ শতাংশ। এ বিষয়ে জাতীয় গড় অবশ্য ২৩.৫ শতাংশ। কিন্তু এই ব্যবস্থা আজ থাকলেও আগামী দিনে তা থাকবে না। কারণ অর্থসঙ্কটের অজুহাতে সরকার নিঃশুল্ক পরিষেবা তুলে দিচ্ছেন, প্রায় বন্ধ করে দিচ্ছেন জীবনদায়ী ওষুধের সরবরাহ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাইভেট পাবলিক পার্টনার শিপ-এর নামে জেলা থেকে ব্লক পর্যন্ত ৫০০-র বেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছেন। সরকার বহু বেসরকারি নার্সিং, ফার্মাসি টেকনিশিয়ান কলেজের ছাড়পত্র দিয়েছে পরিকাঠামো না দেখেই। বাইপাসের দু'ধারে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিক্রির বিরাট বাজার গড়ে উঠছে — সেখানে নগদ অর্থে কিনতে পাওয়া যাবে চিকিৎসা। কিন্তু সুচিকিৎসা পাওয়া যাবে কি? আজ চিকিৎসকদের লোভ ও লালসায় ধনে প্রাণে শেষ হচ্ছেন মানুষ, আগামী দিনে আরও হবেন, গরীব আধপেটা খাওয়া মানুষেরা বিনা চিকিৎসায় অসহায়ের মতো মরবেন — মেহনতি মানুষের সরকার গরীব মানুষের জন্য ৩২ বছরে এই উপকারটুকু করতে পেরেছে।

বাঙালীর আগ্রহ বিস্তর ঃ সোয়াইন

অর্ণব নাগ ।। একটা পাতি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আর তাই নিয়েই বিশ্বজুড়ে বেঁধেছে ধুন্ধুমার কান্ড। যে ভাইরাসের দাপটে WHO (World Health Organisation) -কে একপ্রকার হুলিয়া জারি করে বলতে হয়েছে যে, ভাইরাসটি তার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় পৌঁছে গিয়েছে যাকে কিনা বলা হয় ফেজ — ৬, সুতরাং সদা সতর্ক থাকুন। হু' যে তথ্য-টথ্যগুলো এখনও অবধি দিয়েছে তা রীতিমতো দমবন্ধ করা। ৭৬টি দেশের মোট ৩৫,৯২৮ জন এখনও অবধি এই ভাইরাসে আক্রান্ত যার মধ্যে ১৬৩ জনের মৃত্যুও হয়েছে। এবার আশা করি বুঝতে পারছেন, ভাইরাসটির নাম সোয়াইন ফ্লু। চমকে ওঠার কোনও কারণ নেই। ঠিকই পড়ছেন। সোয়াইন ফ্লু হল একধরনের পাতি ইনফ্লুয়েঞ্জা— এ ভাইরাস। বিজ্ঞানের ভাষায় যার সঙ্কেত HINI। ডাক্তাররা বলেন যে কোনও ভাইরাসেরই নাকি কোনও ওষুধ নেই। কেবলমাত্র 'সার্পোটিভ মেডিসিনের' ওপর নির্ভর করেই এর চিকিৎসা করা হয়। সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসেরও তার ব্যতিক্রম হবার কোনও কারণ ছিল না। তবুও ব্যতিক্রম হচ্ছে। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে রোগটির উৎপত্তি শুয়োর থেকে। ডাক্তাররা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন 'সার্পোটিভ মেডিসিন' দিয়ে শুয়োরের মধ্যে যে ভাইরাস (H_3N_2) রয়েছে তা নিরাময় করা সম্ভব। কিন্তু ওই ভাইরাস যখন মানব দেহে সংক্রামিত হচ্ছে তখন তা আরও শক্তি সঞ্চয় করে যে ভাইরাস (HINI) সৃষ্টি করছে তা নিরাময়ের ক্ষমতা জাহির করতে একটু সমস্যা হচ্ছে বলে ডাক্তারবাবুরা নিজস্ব অসহায়তা ব্যক্ত করেছেন।

এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রথম ঘটে আমেরিকায়। তারপর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মেক্সিকোয়। আমেরিকায় এখনও অবধি মৃতের

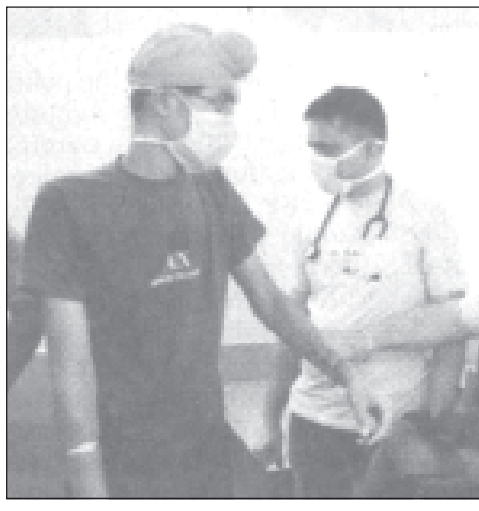

সংখ্যা ৪৫ এবং মেক্সিকোয় ১০৮। এমনিতেই ফ্লু ভাইরাস খুবই ছোঁয়াচে রোগ। তার ওপরে কোনও বিমানযাত্রীর সৌজন্যে তা বিমানে প্রবেশ করলে সেই রোগের বিশ্বায়ণ খুবই সহজ ব্যাপার। সোয়াইন ফ্লু'র ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তবে ভারতে এই রোগের আবির্ভাবের ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। এখনও পর্যন্ত সোয়াইন ফ্লু আক্রান্ত এই অভিযোগে বহু লোককে টানা-হ্যাঁচড়া করা হয়েছে। তবে সবক্ষেত্রে তা প্রমাণ করা যায়নি। যার জন্য হু পত্রপাঠ জানিয়ে দিয়েছে, ভারতে সোয়াইন ফ্লু আক্রান্তের কোনও

হাসপাতাল তো নয় যেন নরক

বিশেষ সংবাদদাতা ।। আমাদের নিম্নবিত্ত পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে প্রথমেই আত্মীয়রা আগে দেখে নেন, ঘরে কি রয়েছে? নার্সিংহোমে চিকিৎসা করানো সম্ভব কি না? একেবারে নিরুপায় না হলে সকলেই প্রথমে বেসরকারি বিকল্পের খোঁজে থাকেন। বলা যায়, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি রাজ্য প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার এত রমরমা। অনেকে মনে করেন প্রশাসন চালানোর ব্যাপারে পেশাদারি দক্ষতার অভাবই এর কারণ। আবার আজ অনেকে বলছেন, এই উদাসীনতা পুরোপুরি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বেসরকারি নার্সিংহোম, পলিক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকের ব্যবসা বাড়ানোর স্বার্থে। সরকারি হাসপাতালে যন্ত্রপাতির তার খোলা থাকলে বেসরকারি ক্লিনিকের ব্যবসার রমরমা হওয়ারই কথা।

বামফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন করেছিলেন। উপদেষ্টা কমিটি, পঞ্চায়েতের দুই স্তরে স্থায়ী কমিটি এবং বড় বড় হাসপাতালে পরিচালন বোর্ড। আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে সিপিএম নেতারা বলে দিয়েছিলেন, পরিচালন কমিটি হাসপাতালে পরিচালনায় যে কোনও বিষয় পর্যালোচনা করতে পারবে, পরামর্শ দিতে পারবে। ওই কমিটির পরামর্শ কেউ উপেক্ষা করলে কর্তৃপক্ষকে দিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে কী হল? ওই পরিচালন কমিটিগুলি শেষ পর্যন্ত সিপিএম দলের নেতাদের মাতববরির আখড়া হয়ে দাঁড়াল।

সমাজবিরোধী কার্যকলাপ এবং দুর্নীতি যেন সবকটি সরকারি হাসপাতাল চত্বরে পাশাপাশি বাস করে এবং সেই দুর্নীতি সর্বস্তরে। ওপেন হার্ট সার্জারি করার অনামী ডাক্তার রোগীর আত্মীয়কে আড়ালে টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন এরকম নজির কম নেই। দরকার নেই তাও পেসমেকার বসাবার জন্য রুগীকে বলছেন। কারণ প্রতি পেসমেকারে অন্তত ৮ হাজার টাকা কাটমানি। সরকারি যে কোনও হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের করিডরে যান, নিশ্চিতভাবেই আপনার সঙ্গে বেশ কিছু পেসমেকার নির্মাতা কোম্পানীর দালালের দেখা হয়ে যাবে। এক একদিনে দশটা পেসমেকার বসানোর ব্যবস্থা হলেই থোক ৮০ হাজার টাকা রোজগার। সরকারি হাসপাতালে একবার যিনি গেছেন তিনিই জানেন, কত ধরনের দুর্নীতি হয় সেখানে। রোগী ভর্তি করতে হবে দালালের মাধ্যমে। কোথাও কোথাও দালালি ব্যবস্থার মধ্যে হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্তারাও জড়িয়ে পড়েছেন। আর বেসরকারি হসপিটাল, পশ্চিমবঙ্গে যা রয়েছে তা এক ধরনের ডাকাতের আস্তানা। অর্থাৎ রোগীদের সেখানে কোনও কোনও ভাবে খরচ করতে বাধ্য করা হয়। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে হয় সেই হাসপাতালেই। অভিযোগ আর তার অস্বীকার দুই-ই আছে ঠিকই, কিন্তু চিকিৎসা প্রার্থী মানুষের কি হবে?

গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর কথা না বলাই ভালো। নিতান্ত বিপদে না পড়লে কেউই ওমুখো হন না। আর গিয়েও যে খুব কিছু লাভ হয় তা নয়। লাভ একটাই। স্বাস্থ্য কেন্দ্র রেফার করে দিলে শহরের হাসপাতালে ভর্তি করতে সুবিধা হয়। তবে এক্ষেত্রে পার্টি নেতার চিঠি থাকলেও আরও বেশি কাজ হয়। তাই গ্রামের মুমূর্ষু বাড়ির লোকেরা আগে ছোটেন পার্টি অফিসে। কারণ প্রাথমিক চিকিৎসার ন্যূনতম ব্যবস্থাও নেই অধিকাংশ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। জীবনদায়ী ওষুধ তো পরের কথা স্যালাইন অক্সিজেনটুকুও থাকে না। সেখানে সব কিছুই নেই নেই। একজনও ডাক্তার নেই এমন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যাও পশ্চিমবঙ্গে খুব একটা কম নয়। এমনও আছে যেখানে প্যারাসিটামল এবং মেট্রোজিল জাতীয় ওষুধ দিয়ে যাবতীয় অসুখের চিকিৎসা হয়। গ্রামের অনেক মানুষকেই তাই বলতে শোনা যায় আমাদের ওষুধও চলে, সঙ্গে টোটকা, তাবিজ, জলপোড়াও চলে। কোনটায় কাজ হয় কে জানে? গ্রামীণ হাসপাতালের ওপর মানুষ ভরসা হারিয়েছে এটা কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে বোঝা যাবে না। সেখানে সব সময়ই উপচে পড়া ভিড়। আসলে এক একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল লক্ষাধিক মানুষ। রোগজ্বালা লেগেই আছে বারোমাস।

পঞ্চাশভাগ গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখনও বিদ্যুৎ নেই। সেখানে হ্যারিকেনের আলোই চিকিৎসক এবং রোগী উভয়েরই ভরসা। আরও বড় অভাব স্বাস্থ্যকর পরিবেশের। রক্ষণা-বেক্ষণের অভাবে ভেঙে পড়া বাড়ি। পানীয় জলের অভাব তো রয়েইছে। সব মিলিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে রোগ সারার এবং রোগ বাড়ার সম্ভাবনা সমান সমান। মহাকরণ থেকে যতই ঢক্কা নিনাদ আর আমুল সংস্কারের কথা বলা হোক, জেলাগুলোতে তার প্রতিফলন খুব কমই পড়ে। তাই সর্বত্র চোখে পড়বে অব্যবস্থার ছবি। এই অবস্থাটা শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের মানসিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক থাকলে ডাক্তারদেরও আর রোগীর আত্মীয়দের হাতে মার খেতে হতো না। এই মুহূর্তে বর্ষা আসন্ন। আমরা যদি গ্রামের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রামীণ হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল ও খোদ কলকাতার হাসপাতাল গুলিতে খোঁজ নিই তাহলে দেখবো সাপে কামড়ানো রোগীদের চিকিৎসার জন্য 'অ্যান্টিভেনম সিরাম' নেই।

চিকিৎসকরা রোগীর অসহায় মৃত্যু দেখবেন আর মার খাবেন। সরকার নীরব দর্শক থাকবে। বাণিজ্যমুখী এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলে ডাক্তারবাবুরা দৌড়ে চলেছেন অর্থের পিছনে। বিসর্জন দিয়েছেন মূল্যবোধ ও মানবিকতা। প্রফেশন থেকে তাড়িয়েছেন সেবা ধর্মকে। কোনও একজন রোগী দুর্ঘটনার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যখন এমারজেন্সিতে আসছেন তখন কিছু ডাক্তার বেড নেই — এই অজুহাতে তাকে ভর্তি করা তো দূরে থাক, তার জীবন রক্ষার জন্য এমাজেন্সী চিকিৎসাও শুরু করছেন না। আসলে সেবাবিহীন মানবিকতাবিহীন বাণিজ্যমুখী বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় ডাক্তারবাবুদের মূল মন্ত্র এখন অর্থ অর্থ আরও অর্থ। আর এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত ছোট বড় সমস্ত ডাক্তারবাবুদের দৌড়াতে হচ্ছে সারাদিন। শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। হাসপাতাল থেকে নার্সিহোমে, কিংবা ক্লিনিক থেকে ক্লিনিকে। সারাদিন খেপ খেলা এই ডাক্তারের দল একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর নিজেরাই হয়ে যাচ্ছেন একজন রোগী। হারিয়ে ফেলছেন মস্তিষ্কের বিচার বুদ্ধি কিংবা রোগ নির্ণয় ক্ষমতা। ফলে প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে চিকিৎসা বিভ্রাট। এই বিভ্রাটের শিকার হয়ে কাউকে ভুগতে হচ্ছে দীর্ঘদিন, কাউকে বা হারাতে হচ্ছে শরীরের কোনও অঙ্গ অথবা কাউকে আবার ভুল চিকিৎসার জন্য ইহলোকের মায়া কাটাতে হচ্ছে। ঠিক বা বেঠিক চিকিৎসা যাই হোক — পকেটে পয়সা এলেই হল। যদিও মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতায় লিভার প্রতিস্থাপন, দুরূহ হার্ট অপারেশন বা বুকে এফোঁড় ওফোঁড় করা লৌহ শলাকা বার করার মতো জটিল অপারেশন হয় বটে কিন্তু তবুও সরকারি হাসপাতালগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ।

সেবাবিহীন মানবিকতাবিহীন বাণিজ্যমুখী বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় ডাক্তারবাবুদের মূল মন্ত্র এখন অর্থ অর্থ আরও অর্থ। আর এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত ছোট বড় সমস্ত ডাক্তারবাবুদের দৌড়াতে হচ্ছে সারাদিন। শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। হাসপাতাল থেকে নার্সিহোমে কিংবা ক্লিনিক থেকে ক্লিনিকে। সারাদিন খেপ খেলা এই ডাক্তারের দল একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর নিজেরাই হয়ে যাচ্ছেন একজন রোগী। হারিয়ে ফেলছেন মস্তিষ্কের বিচার বুদ্ধি কিংবা রোগ নির্ণয় ক্ষমতা। ফলে প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে চিকিৎসা বিভ্রাট।

সোয়াইন ফ্লু-ই বা বাদ থাকে কেন?

খবর নেই। কিন্তু বেসরকারি সূত্র অন্য কথা বলছে। তাদের মতে ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ৩০। জলন্ধরে সাত শিশুর রক্তে ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। এছাড়াও বিদেশ থেকে আগত উড়ানে বহু ব্যক্তির দেহে এ জাতীয় ভাইরাসের

সন্ধান মিলেছে। তাঁরা আসছেন মূলত আমেরিকা থেকেই। কিছুদিন আগেই আমেরিকার নাসা ফেরতা আট ভারতীয় ছাত্রের দেহে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের খোঁজ পাওয়া গেছে। সেই কারণেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মার্কিন সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, সে দেশ থেকে যে সব যাত্রীরা দেশান্তরে যাবেন, বিমান ওঠার আগে যেন তাদের ভাইরাস টেস্ট করা হয়। বিশ্বব্যাপী খবর সম্পর্কে বাঙালীর আগ্রহ বিস্তর। সোয়াইন ফ্লু-ই বা বাদ থাকে কেন? তাই তাদের সব জিজ্ঞাস্যকে মোটামুটিভাবে সাজিয়ে তার উত্তরটাও দেবার যথাসম্ভব চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন —

❐ সোয়াইন ফ্লু'তো শুয়োরের হবার কথা, মানুষের হচ্ছে কি করে?

উত্তর ঃ ঠিকই। সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করে না। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে মানুষ এতে আক্রান্ত হতেই পারেন। যেমন ধরা যাক, শিশুরা কোনও মেলায় শুয়োরের সংস্পর্শে এলে বা শ্রমিকরা 'সোয়াইন ইন্ড্রাস্ট্রি'তে কাজ করার সময় যদি শুয়োরদের নিকটে সরাসরি আসেন তবে তাঁরা আক্রান্ত হতেই পারেন। এতে ঘাবড়ে যাওয়ার কোনও কারণ নেই। যদি কোনও শুয়োরের সোয়াইন ফ্লু হয়ে থাকে তবেই সংস্পর্শে আসা সেই ব্যক্তি আক্রান্ত হবেন, নচেৎ নয়।

❐ সোয়াইন ফ্লু হয়েছে কোন লক্ষ্মণ বা 'সিম্পটম' দেখে বুঝব?

উত্তর ঃ সোয়াইন ফ্লু বোঝার জন্য বিশেষ কোনও 'সিম্পটম' নেই। মরসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই এর লক্ষণসমূহ। যেমন — জ্বর আসবে, কাজে আলস্যভাব থাকবে, খিদেয় অরুচি থাকবে, বুকে কফ জমে যাবে ইত্যাদি।

❐ শুয়োরের মাংস খেলে কি সোয়াইন ফ্লু হতে পারে?

উত্তর ঃ না। খাদ্যের মধ্যে দিয়ে সোয়াইন ফ্লু'র প্রবহণের কোনও সম্ভাবনাই নেই। ১৬০° তাপমাত্রায় সোয়াইন ফ্লু'র ভাইরাস সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। ওই তাপমাত্রার অনেক বেশি

(এরপর ১৩ পাতায়

ভোট কাটার তত্ত্ব

একটা নির্বাচন, বিশেষ করে সাধারণ নির্বাচন এলে আমরা অনেক কিছু শিখি, নানা বিষয়ে আমাদের চোখ খুলে যায়! ভোটের নানা 'তত্ত্ব' সম্বন্ধে সাধারণ নির্বাচকরা জ্ঞান লাভ করে।

এবারের অর্থাৎ দেশের পঞ্চ দশ সাধারণ নির্বাচনে অধিকাংশ বাংলা সংবাদপত্র এবং বেসরকারি বৈদ্যুতিন মাধ্যম ভোট প্রচারে, এখন ফলাফলেও এই কথা একনাগাড়ে বলে যাচ্ছে ওই ব্যক্তি বা দল মূল সম্ভাব্য জয়ী প্রার্থীর "ভোট কেটে" নিয়েছে। ভোটের বাজারে এই "ভোট কাটা" কথাটা আমার মতো অনেক ভোটারের কাছে 'তত্ত্ব' বলে মনে হয়েছে। এমনভাবে রিপোর্টাররা কথা দুটো ("ভোট কাটা") পরিবেশন করছেন যেন বিষয়টা নতুন, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভবিষ্যতের নির্বাচনে নির্বাচকদের 'এই ব্যাপারে' সতর্ক থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভাব-ভাবনা এবং বাস্তব প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে "ভোট কাটা" কথা দুটোর বিচার-বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। এই বাদ-বিচারে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি এবং সকল স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের কাছে উন্মুক্ত। তাই ভোটে দাঁড়াবার অধিকার সকলের। মণি-কাঞ্চন, অর্থ এই পথে কোনও বাধা সৃষ্টি করতে পারে না! এখানেই দেখছি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আপত্তি জানানো হচ্ছে ঘুর-পথে। পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ছিল তিন মূল পক্ষ — বামফ্রন্ট, দুই কংগ্রেসের জোট ও বিজেপি। বিচ্ছিন্নভাবে অন্যান্য ছোট-খাটো দল এবং নির্দল ব্যক্তিরাও ছিলেন এই নির্বাচনে। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল ভোট প্রচারের সময় এবং আজও ফলাফল বেরিয়ে গেলেও রিপোর্টাররা 'জোট' প্রার্থীর জয়-পরাজয়ে বিজেপিকে শিখণ্ডী করেছেন ও করছেন। বলছেন, ওই কেন্দ্রে এই বিজেপি প্রার্থী 'ভোট কেটে' ফ্রন্ট প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত করেছে। মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই এই সাংবাদিক বন্ধুরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মূল motto বা উদ্দেশ্য ভুলে গেছেন! ভোটাররা গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পছন্দ-অপছন্দ রেখে তিন প্রার্থীর মধ্যে যাঁকে যোগ্য মনে করেছেন তাঁকে ভোট দিয়েছেন। সেখানে যদি তাঁরা বিজেপির অনুকূলে মত ব্যক্ত করেন, সেখানে অন্যায় ও ভুল কোথায়? ভোটারদের বিচার-বিবেচনায় কি তাঁদের কোনও আস্থা নেই?

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রতিটি ব্যক্তি ও দল তাঁদের রাজনৈতিক, আর্থিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনা উত্থাপন করে জনসমর্থন যাচাই করেন। বিজেপি একটি সর্বভারতীয় দল। বিভিন্ন রাজ্যে তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। কেন্দ্রেও এই দল দু'বার দেশ শাসন করেছে। তাই পশ্চিমবঙ্গেও সেই দল তাদের নীতি, কর্মসূচীর প্রতি ভোটারদের কতটা আগ্রহ ও সমর্থন আছে, তার যাচাই করবেই। এই প্রয়াসে তো কোনও অন্যায় নেই!

তাই কোনও 'জোট' প্রার্থীর বিপরীতে বিজেপি প্রার্থীকে "ভোট কাটার" অজুহাত ও অপবাদ দেওয়া এই সকল সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিম্ন মানসিকতার পরিচয়। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গের এবং দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দাশনগর (হাওড়া) কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে আলামোহন দাস পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এবং সেই সময়কার উত্তর কলকাতা সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। এই দুটো সত্য ঘটনা সাংবাদিক বন্ধুরা যেন সতত স্মরণ করেন। তাই "ভোট কাটার তত্ত্ব" প্রচার করা থেকে সাংবাদিকরা যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হবেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক ভাবনা-চিন্তা ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

রণজিৎ সিং, কলকাতা - ৭০০০৩৬

চিঠিপত্র

অবাস্তব তথ্য

বীর সাভারকর প্রসঙ্গে তথ্যবাহী নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ২৫।৫।০৯) অজিত বিশ্বাস সাভারকর ও সুভাষচন্দ্র বসুর একটি সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করে বলেছেন — ১৯৪০ সালের ২৯ জুন সুভাষচন্দ্র বোম্বের সাভারকর সদনে যান; এবং সে সময় সাভারকর সুভাষচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন যে, জার্মানি ও জাপানের কাছে যে সব ভারতীয় যুদ্ধবন্দী (POW) রয়েছে তাদের নিয়ে জাপান ও জার্মানীতে মুক্তিবাহিনী তৈরি হয়েছে। তথ্যটি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, তখন পর্যন্ত জাপানের সাথে 'মিত্রশক্তি'র লড়াই বাধেনি। স্বাভাবিকভাবেই সে সময় জাপানের কাছে কোনও ভারতীয় যুদ্ধবন্দী ছিল না।

জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ১৯৪১ সালের ৮ ডিসেম্বর। ১৯৪২-এর জানুয়ারিতে মালয়েশিয়া এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি সিঙ্গাপুর পতনের পর ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী তথা আজাদ হিন্দ ফৌজের সূত্রপাত হয়েছিল। অপরদিকে, সুভাষচন্দ্র বার্লিনে পৌঁছবার আগে জার্মানীতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে কোনও মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেনি। তিনি সেখানে পৌঁছবার পর (১৯৪১) প্রথমে এন নাম্বিয়ার, গিরিজা মুখার্জি প্রমুখ মাত্র জনা বিশেক ভারতীয়কে নিয়ে বার্লিনে 'ফ্রী ইনডিয়া সেনটার' গড়ে তোলেন এবং সেটির সামরিক শাখা হিসাবে ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ভেতর থেকে সেনা সংগ্রহ করে ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বরে 'ইনডিয়ান লিজিয়ন' গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন — (সূত্র 'Story of the INA' – S. A. Ayer)।

বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০

মনীষীদের নিয়ে সংখ্যা

বীর সাভারকর সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বিশেষ কিছু জানেন না বলেই মনে হয়। ভারতবাসীরাই আজকাল অভারতীয়ত্বের দিকে যাচ্ছে। বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমও অভারতীয়করণের জন্য নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে। এসময় যাদের নিজস্ব প্রকাশন ব্যবস্থা রয়েছে তাঁরা বীর সাভারকর, শ্যামাপ্রসাদ ও আদি শঙ্কর াচার্যের মতো মহাপুরুষদের বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলে সকলে জানতে পারবেন।

রাধাকান্ত ঘোড়াই, ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

ড্রাগ সংস্কৃতি

স্বস্তিকায় প্রকাশিত নবকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রতিবেদন "আন্তর্জাতিক ড্রাগ ম্যাপে মুর্শিদাবাদ" পড়লাম। সত্যি পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী জমানার এ এক গৌরবময় অধ্যায়। ড্রাগ উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ এখন স্বনির্ভর। বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই ড্রাগের বাজার ক্রমশই জমজমাট হচ্ছে শুনে বামফ্রন্ট সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কলকাতার ফুটপাথ, রেলস্টেশনে এখন প্রগতিশীল হেরোইনসেবীদের জমজমাট আসর দেখে দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল নাগরিকগণ যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করেন। সত্যি তাদের মধ্যে এই নব্য বাম সংস্কৃতির সহনশীলতা একটু বৃদ্ধি পেলে প্রগতিশীল চোলাই সংস্কৃতির মতোন ড্রাগ সংস্কৃতিও আর এক জণগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সহায়ক হবে।

স্বাধীনতার পরবর্তী কালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সময় পর্যন্ত ড্রাগের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। এখন নব্যযুগের কংগ্রেস সিপিএম একাত্ম। মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজনীতি ক্ষেত্রেও এই দুই দলের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি। তাছাড়া রাজ্যে সিপিএম এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার। এই দুই-এর নব্য ড্রাগ সংস্কৃতি জাতিকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ড্রাগ উৎপাদনে বিভিন্ন মুসলমান দেশগুলোই অগ্রগণ্য। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ লাগোয়া ইতিহাস বিখ্যাত মুর্শিদাবাদ জেলাকে ড্রাগ উৎপাদন কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ। এই সব দেখে মনে হচ্ছে, এখন ভারতবর্ষে স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের চেয়ে বিদেশী জাগরণ মঞ্চ যথেষ্ট শক্তিশালী। এইসব অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের কি এখনও জেগে ওঠার সময় হয়নি? কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। এমন অনেক আছেন যারা দেখে বা ঠেকে কিছুতেই শেখে না। আমরা কোন পথে?

শ্যামা প্রসাদ দাস। অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

আয়লা ও আমরা

হরষিত মন্ডল

গত ২৪ মে রবিবার বিকাল থেকে বুঝতে পারছিলাম, আমরা ভয়ানক প্রাকৃতিক এক তাণ্ডবের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি। আমরা যেহেতু সুন্দরবন এলাকার ব-দ্বীপের মানুষ, প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। তাই বন্যা, খরা, নদী ভাঙন এদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আছে, দুঃখ আছে, এক কথায় জন্মসূত্রে আমরা এই প্রাকৃতিক লীলা খেলার শিকার।

তাই সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে বার বার যখন সতর্কবার্তা আসছিল, আমরা সব শোনবার পরও খুব বেশি সতর্ক হতে পারেনি। আর সামান্য অসতর্কতার কারণে কত শত প্রাণ চলে গেল, কত মানুষ সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ল তার খতিয়ান দেখতে দেখতে চোখের সামনে ভেসে উঠল---

এ পর্যন্ত মারা গেছেঃ

১. মানুষ

তুষাখালী - ১ জন
আতাপুর - ২৩ জন
মণিপুর - ১০ জন। তবে এখনও হিসাব সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি।

২. গরু -

তুষাখালী - ১২০৩ টি
আতাপুর - ২২৪ টি
মণিপুর - ১৯৩১ টি
জয়গোপালপুর - ২০৭ টি
ধুচনীখালী - ১৮১ টি
কোড়াকাটি - ৮ টি

৩. ছাগল - অসংখ্য।

৪. বাড়ি সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত -

তুষাখালী - ২০০৯টি
আতাপুর - ১৭০৬ টি
মণিপুর - ১৯১৭ টি
জয়গোপালপুর - ৫২৭ টি
ধুচনীখালী - ৬০৪ টি
কোড়াকাটি - ৫৮১ টি
মোট ঃ ৭৩৪৪ টি

৫. আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত -

তুষাখালী - ১১৩ টি
আতাপুর - ২৫ টি
মণিপুর - ১৩ টি
জয়গোপালপুর - ৮৮৯ টি
ধুচনীখালী - ১০১১ টি
কোড়াকাটি - ১০৮৮ টি
মোট ঃ ৩১৩৯ টি

এছাড়া অন্তত কমবেশি ২৮,০০,০০০ (লক্ষ) টাকার চাল, ২৫ লক্ষ টাকার ধান, এক কোটি টাকার মাছ, ২০ লক্ষ টাকার সব্জী এবং নগদ বহু লক্ষ টাকা ভেসে গেছে। কমবেশি এক কোটি টাকার গাছ ক্ষতি হয়েছে। ধ্বংস হওয়া ঘরগুলি মেরামত করতে কমপক্ষে ঘর পিছু ২০,০০০ টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ঘরগুলি মেরামত করতে গেলে ঘরপিছু ৫০০০ টাকা করে লাগবে।

এই মুহূর্তে (প্রথম দিকে) প্রতিদিন সরকারি ও অন্যান্য সহযোগী বাদ দিয়েও ৫ কুইন্টাল চাল, ২ কুইন্টাল ডাল ও পরিমাণ মতো তেল মশলা প্রয়োজন। এ ছাড়া শিশু খাদ্য ঔষধপত্র ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সোমবার সকাল থেকে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ বাড়ছিল, সমস্ত মানুষের মনেও বাড়ছিল আশঙ্কা--- আবার

বেলা বাড়ছে ঝড় বাড়ছে। ছেলেমেয়েদের বাড়ির বাইরে যেতে নিষেধ করছে---কেউ কোথাও যেও না। বেলা নয়টা নাগাদ

জনমত

রায়মঙ্গলের জল বাড়ছে, বালী নদী ভেসে গেছে। বাড়ছে ঝড়ের গতিবেগ, গাছপালা ভেঙে পড়ছে। বেলা ১০টা ঃ রমাপুরের নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে খবর ছড়িয়ে পড়ল। বেলা ১১টা ঃ সবাই গরু-বাছুর গোয়াল থেকে ছেড়ে দিচ্ছে, যে যেখানে গিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। বেতারের সংবাদ — সন্দেশখালির অবস্থা ভয়াবহ। সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত নায়ক, শঙ্কর মণ্ডল, সুনীল বড়ুয়া, দিলীপ দাস সবাইকে ডেকে নিয়ে ছুটতে শুরু করল নদীর বাঁধের দিকে। প্রত্যেকের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জন নিয়ে বাঁধের ফাটল রোধ করার চেষ্টা করছে। বেলা ১২ নাগাদ প্রথম বিশাল ঢেউ রায়মঙ্গলের বাঁধ ছাপিয়ে আছড়ে পড়ল গ্রামের উপর। আরও ৩০ জনের সঙ্গে প্রশান্ত নায়কেও ভেসে গেল জলের টানে। ঢেউর ক্ষিপ্রতায় তার দেহ একটা ভাসমান খড়ের চালের ওপর উঠে গিয়েছিল।

ততক্ষণে সন্দেশখালি, মণিপুর, কোড়াকাটি, ধুচনীখালী, তুষখালী, আতাপুর, খুলনা, শিতলিয়া, কালিতলা, ঘুমটে, গোবিন্দকাটি, পুইজালী, মৌখালী, মোল্লাখালা, যোগেশগঞ্জ, কুমিরমারী প্রত্যেকটা অঞ্চল জলের তলায় ডুবে গেছে। প্রকৃতির রুদ্র রোষে হারিয়ে গেছে শত শত প্রাণ। প্রাকৃতিক জলের তাণ্ডব সমস্ত রং-কে ধ্বংস করে জলের আকার তৈরি করছে। তাই আজ অবনী রায় লক্ষণ অধিকারী ও অনুকূল কয়ালরা এক সঙ্গে ছুটছে ত্রাণের জন্য।

রাস্তায় ত্রিপলের নীচে একসঙ্গে বাস করছে ধনী, দরিদ্র সব রাজনৈতিক দলের জিগির তোলা দামাল সমর্থকরা। এখানে সবার একটাই সমস্যা---খাবার, ত্রিপল, নদী বাঁধ।

জ্ঞান ফেরার পর প্রশান্ত নায়েক দেখেছে একটা উঁচু রাস্তার গায়ে বেঁধে থাকা খড়ের চালের ওপর পড়ে আছে সে। কিন্তু তার সঙ্গী ৩০ জনের মধ্যে ৮ জনের মৃতদেহ তারই পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অন্য তেরজনকে জীবিত পাওয়া গেলেও আর ৯ জনকে আজও পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে প্রশান্ত নায়েকদের বুকফাটা আর্তনাদ---"ভাইসব, তোমরা ফিরে এসো। আমরা সবাই মিলে রায়মঙ্গলের বাঁধ বাধতে যাব---আর তুমি যেন কোনওদিনও ফিরে এসো না---আয়লা।"

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

তিনরামায়ণের কথা

কিরণশঙ্কর মৈত্র

ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য-মন্ডিত ক্লাসিক রামায়ণ কাহিনী নানা দেশে আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় রাম-কথার নব-রূপায়ণ যেমন চমকপ্রদ তেমনি আকর্ষণীয়। বর্তমান নিবন্ধ তিন দেশের রাম-কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

।। ১ ।।

বৃটিশ রামলীলা

দশ বছর আগে চেন্নাই থেকে মুম্বাইয়ের এক ট্রেনজার্নিতে ডেভিড ফার হঠাৎই রামায়ণ কাহিনীর পরিচয় পান। কলকাতায় এক বন্ধুর বিবাহানুষ্ঠানের পরে ডেভিড ভারত দর্শনের জন্যে ট্রেনে উঠে বসেন। ট্রেনে উঠে দেখেন, তার কাছে পড়বার মতো কিছু নেই। তাই তিনি রেল স্টেশনের একটি বুক স্টলে গেলেন। সেখানে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সি রাজাগোপালাচারির রামায়ণ। একটি কপি কিনে তিনি ট্রেনে উঠে বসলেন। এইভাবে লন্ডনের এক বৃহত্তম থিয়েটার 'দ্য লিরিক'-

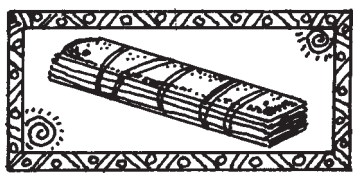

সনাতনী শিক্ষা

এর ডিরেক্টর ডেভিড ফার-এর সঙ্গে রামায়ণের পরিচয়। রামায়ণ পড়ে তিনি মুগ্ধ ও চমৎকৃত হয়ে গেলেন। রাম চরিত্র এবং সীতার জন্যে তাঁর প্রেম, হনুমান চরিত্র এবং সংশ্লিষ্ট প্রতীকময়তা দশ বছর ধরে তাঁর মনকে প্রভাবিত করে রাখে। শুধু তাই নয়, তিনি লন্ডনবাসীদের সঙ্গে রাম-কাহিনীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মনস্থ করলেন। তিনি রাম-কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়ে লন্ডনের দর্শকদের কাছে তাকে উপস্থিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ডেভিডঅবশ্যই পিটার ব্রুকের অন্য ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের অভিযোজনার কথা শুনেছিলেন এবং পর্দায় সেটি দেখেছিলেনও। বয়স কম থাকায় মহাভারতের নাট্যরূপ দেখার সুযোগ তার হয়নি, তিনি শুনেছিলেন যে পিটার ব্রুক চমৎকারভাবে রূপায়িত করেছেন মহাভারতের। তাই তিনি ভাবলেন — তিনি রামায়ণের নাট্যরূপ দেবেন। তিনি জানতেন যে তার বিদেশি দর্শকেরা রামায়ণ মহাকাব্যের কাহিনীর সঙ্গে তেমন পরিচিত নয়, তাই তিনি কাহিনীর মধ্যে খানিকটা লঘুরস পরিবেশন করতে চাইলেন। ডেভিড জানতেন, রামায়ণের কাহিনী সবার কাছেই আবেদনময়। কারণ এর মধ্যে রয়েছে প্রেম, বিচ্ছেদ ও বেদনা, তার উপরে ছড়িয়ে আছে এক পবিত্র সারল্য, যার সঙ্গে রয়েছে সবার মনে সাযুজ্য। এইভাবে তিনি রামায়ণের নাট্যরূপে অগ্রণী হলেন।

বৃটিশ এশিয়ান সঙ্গীত জগতে সংযুক্ত শ্রীর সাহায্য নিলেন তিনি। সেই সঙ্গে নিলেন অভিনেতা পল শর্মাকে (যিনি রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন)। রামায়ণের উপরে ব্যাপক গবেষণায় মগ্ন হলেন ডেভিড। বেনারসে এসে 'রামলীলা'র অভিনয় দেখলেন। রামলীলা দেখে আবার রামায়ণের প্রতি মুগ্ধ হলেন তিনি। তার নাট্যরূপে তিনি জোর দিয়েছেন রামের সমস্যা, তার বনবাস, সীতাহরণ, রাবণের সঙ্গে সংগ্রাম এবং সীতা উদ্ধারের উপর। কারণ দু'ঘন্টার মধ্যে রামায়ণের সব কিছুর উপস্থাপনা সম্ভব নয়।

(এরপর ১৩ পাতায়)

ঈশ্বর পুরুষের রঙ্গরস

মহাযোগী লোকনাথ বাবা

।। বৈদেহীনন্দন রায়।।

মানুষের মানসিক প্রকৃতি গঠিত নবরসে। এই নবরস হল — শৃঙ্গাররস, হাস্যরস, করুণরস, রৌদ্ররস, বীররস, বীভৎসরস, অদ্ভুতরস, শান্ত ও বৎসলরস। মানব প্রকৃতির বিভিন্ন সংবেদনশীলতার প্রকাশ এদের কেন্দ্র করে। প্রতিদিনের হাসি, কান্না, বেদনা, ভয়, স্থৈর্যের নিয়ামক এরাই।

সাধারণ মানুষ যেমন এর বাইরে নয়, ঈশ্বর পুরুষরাও সর্বপাশমুক্ত হয়েও এড়িয়ে যান না এই নবরসকে। বলা যায় এদের ভূমিকা তখন তাঁদের লীলাসঙ্গীরূপে। তাঁদের হাসি, ক্রোধ, বেদনার মধ্যে সঞ্চারিত থাকে মানুষের মানবিকত্ব গঠনের ঈপ্সা। চেতনাকে জাগ্রত করেন তাঁর সহজবোধ্য শ্লেষাত্মক হাস্যরসে। যে হাস্যরসে থাকে প্রজ্ঞার দীপ্তি, সত্যের গাম্ভীর্য আর জীবনের বাস্তবতা। তাঁদের রঙ্গরস বা কৌতুক মোহগ্রস্ত মানুষের মানসিক ক্লৈবত্ব মোচনে। বিষয়াসক্ত মনকে জাগ্রত করেন তাঁরা পরিহাসের স্নিগ্ধ প্রক্ষেপণে। ঈশ্বর পুরুষদের সেই রঙ্গরসিকতা নিয়ে এই প্রতিবেদন।

মহাযোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারী

১২৮০ বঙ্গাব্দের কোনও এক সময়। মহাযোগী লোকনাথ তখন পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) বারদীতে আশ্রম স্থাপন করে অবস্থান করছেন।

ওই সময় ঢাকার এম এ এবং বি এ ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র এলেন বাবার দর্শনে। বাবা তাদের আসাতে বিরক্ত বোধ করলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসেছে তারা। ছাত্ররা সমস্বরে বলল — আমরা আপনার কাছে এসেছি ব্রহ্ম কি তা জানতে। আমাদের এ বিষয়ে কিছু বলুন। বাবা মুখে কৌতুক

হাসিরেখা টেনে বললেন — অখন্ড মন্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম / তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ। অর্থ হল, যা অখন্ডমন্ডলাকার, যাঁর দ্বারা চরাচর ব্যাপ্ত, এহেন ব্রহ্মকে যিনি দর্শন করান, সেই গুরুকে প্রণাম করি।

শ্লোকটা কিছু বুঝলে — প্রশ্ন করেন তিনি, ছাত্রদের দিকে স্থির শান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

কিছু বুঝি। অবশ্য আপনি যদি ভালভাবে বুঝিয়ে দেন। বাবা এবার কৌতুকদীপ্ত স্বরে বললেন — তোমাদের ব্রহ্ম কি জান? টাকা -— টাকা। কারণ টাকা অখণ্ড এবং মন্ডলাকার। চরাচর জগতে টাকারই প্রভুত্ব চলছে। তোমরা সেই টাকা ব্রহ্মদর্শনের জন্য দীক্ষিত হয়েছ। প্রফেসার গুরুরা তোমাদের এই টাকা-ব্রহ্মকে অর্জন করার পথ দেখিয়ে দেন। সুতরাং টাকা ব্রহ্মের উপাসনার পর ভোগ শেষ হলে অন্য ব্রহ্মদর্শনের ইচ্ছা হলে এসো, তখন যা বলার বলব।

প্রেমানন্দ ভারতী পূর্বাশ্রমে একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরও তিনি লেখালেখি ত্যাগ করেননি। ইচ্ছা হল বাবার জীবনী তিনি লিখবেন। সে উদ্দেশ্যে একবার এলেন বাবার বারদী আশ্রমে। বাবার কাছে আর্জি জানালেন তাঁর জীবনী লেখার অনুমতি দিতে। বাবা শুনে কৃত্রিম কোপচ্ছলে বললেন — ওঠ্ ওঠ্ এখান থেকে। আমার আবার জীবনী! রামায়ণ রয়েছে, মহাভারত রয়েছে। কজন লোক রাম-লক্ষ্মণ হয়েছে? মহাভারত পড়ে কজন যুধিষ্ঠিরাদির মতো ন্যায় ও সত্যপরায়ণ হয়েছে? কটা ধ্রুব-প্রহ্লাদ জন্মেছে? রেখে দে ওসব।

একবার বাবার বারদী আশ্রমে পুরীধামের এক পান্ডা এসেছেন দর্শন করতে ও বাবাকে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দেবার জন্য। পান্ডার ধারণা হিন্দু মাত্র সকলেই মহাপ্রসাদ গ্রহণের জন্য লালায়িত থাকেন।

পান্ডা মহাপ্রসাদ নিয়ে বাবার কাছে এগোতেই বাবা বলে উঠলেন — আমি মুসলমান। পান্ডা হতভম্ব। তড়িতাহতের অবস্থা। মহাপ্রসাদ বাবাকে না দিয়েই তাড়াতাড়ি আশ্রম ত্যাগ করলেন।

ভক্তরাও কম অবাক নন। তাঁদের মনের ভাব বুঝে বাবা হাসতে হাসতে বললেন — মুছুল্লুম্ ইমান্ যার সেই মুসলমান। আমার ষোলআনা ইমান আছে। ইমান লাভের জন্যই

প্রসাদ গ্রহণ করা। ইমান থাকার জন্য প্রসাদ গ্রহণের আর প্রয়োজন নেই আমার। বাবার কথার হেঁয়ালি এবার ভক্তদের হৃদয়ঙ্গম হল। যাঁর ঈশ্বরত্ব লাভ হয়েছে, তাঁর আর প্রসাদ ভক্ষণের আবশ্যকতা নেই।

ভক্তরা মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

সূত্র — ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রণীত সিদ্ধ জীবনী।

কেদারেশ্বর সেনগুপ্তর লোকনাথ মাহাত্ম্য।

অবহেলার অন্ধকারে

রঘু ডাকাতের কালীবাড়ি

বিশ্বজিৎ নাথ ।। আজও অবহেলার অন্ধ কারে পড়ে রয়েছে হিন্দুদের পবিত্র স্থান, রঘু ডাকাতের স্মৃতি বিজড়িত পাঁচশো বছরের

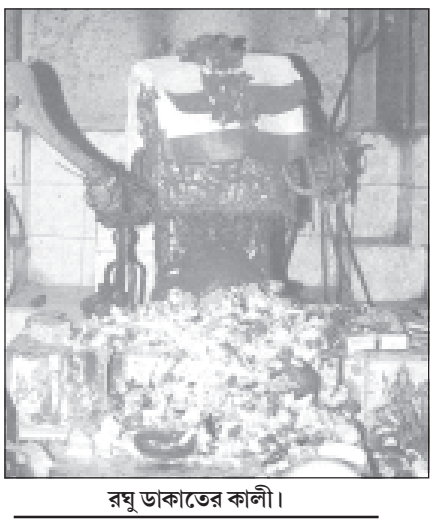

রঘু ডাকাতের কালী।

অধিক প্রাচীন উত্তর ২৪ পরগণার কাঁচড়াপাড়ার বাবু ব্লকের ডাকাতে কালীবাড়ি। জানা গেছে, তৎকালীন ডাকাতেরা নারীকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করত। আর সকলেই শক্তিদেবী কালীর ভক্ত ছিল।

উত্তর ২৪ পরগণার বীজপুর থানা এলাকার আজকের কাঁচড়াপাড়া অতীতের কাঞ্চনপল্লীর বহু এলাকা ছিল ঘন বনে ঢাকা। আর গভীর অরণ্য কবলিত এলাকায় ছিল ডাকাতদের আস্তানা। আজ যেখানে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, অতীতে সেখানে ছিল একটি প্রাচীন নিমগাছ। আর ওই গাছের নীচেই ছিল কালীমায়ের থান, গাছটিতে ডাকাতেরা সিঁদুর-চন্দন চর্চিত করে কালীজ্ঞানে পূজা করত। প্রতি অমাবস্যার রাতে ওই থানের সামনে নরবলি দিয়ে ডাকাতেরা অভিযানে পাড়ি দিত। কথিত আছে, এই অঞ্চলটি ছিল কুখ্যাত রঘু ডাকাত ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের ডেরা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষ দিকে জলা-জঙ্গল কেটে পরিস্কার করা হয়। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর থেকে আগত এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ডাকাতকালীর থানটি সংস্কার করেন। এমনকী গাছটির গুঁড়ির চারদিকে বেদী তৈরি করে তামার ফলকে দক্ষিণাকালীর মূর্তি খোদিত করেন। তারপর জনগণের অনুদানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

আরও জানা গেছে, দিনের বেশির ভাগ সময় ওই পণ্ডিত তর্জা গান গেয়ে সময় কাটাতেন। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি হারমোনিয়াম উপহার দিয়েছিলেন। অবশেষে হারমোনিয়ামের সাহয্যে গানকে আরও সুন্দর করে জনমানসে তুলে ধরেন। তখন থেকেই তাঁকে হারমোনিয়ামবাবা বলে ডাকা শুরু করে সকলে। আর ওই হারমোনিয়ামবাবাই 'ডাকাতে কালীর' স্থানটি সংস্কার করেছিলেন। বাবু ব্লকের ডাকাতকালী মন্দিরটি অতি প্রাচীন ও দক্ষিণমুখী। মন্দিরের চূড়াগুলো দেখতে টাওয়ারের মতো। কালী মূর্তি ছাড়াও রাম-সীতা, কৃষ্ণ, রাধিকা প্রভৃতি দেব-দেবীরও মূর্তি রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আগে ডাকাতেরা প্রতি অমাবস্যার দিন নরবলি দিয়ে ডাকাতি করতে যেত, কিন্তু আজ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ক্রমশ ঐতিহ্য হারাচ্ছে হিন্দুদের পবিত্র এই তীর্থস্থানটি। অপরদিকে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পূজারী রামপ্রসন্ন মিশ্র জানান, প্রতিদিনই দেবীর পূজো হয়। শনি-মঙ্গলবার মানুষের প্রচুর ভিড় হয়, এখানকার দেবী খুব জাগ্রতা। সরকার থেকে কোনও রকম সাহায্য মেলেনি।

পার্শ্ববর্তী জেলা ছাড়া কলকাতা, হাওড়া প্রভৃতি এলাকা থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন। তাদের অনুদানেই টিকে রয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন। এখানকার সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে কাঁচড়াপাড়া পুরসভার পুর প্রধান শঙ্কর লাল বসাক জানিয়েছেন, বহু ঐতিহাসিক হেরিটেজ বিল্ডিং রেল এলাকার মধ্যে পড়ে। বাবু ব্লকের ডাকাতেকালী বাড়িটিও -এর ব্যাতিক্রম নয়। রেল দপ্তর থেকে 'নো অবজেকশন' মিললে অথবা রেল পুরসভাকে দায়িত্ব দিলে, তবেই মন্দিরটিকে সুসজ্জিত করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, এইভাবে চাপান-উতোরে বাংলার বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে এই ধরনের বহু ঐতিহাসিক স্থান। এতেও সরকারের ঘুম ভাঙবে কি?

ধীশক্তিসম্পন্না নারী

।। প্রীতি বসু ।।

আয়লার প্লাবিত দেশেও হবে রথযাত্রা। রিমঝিম বর্ষার নিক্কণের নয়, গাছ-গাছালী ঘেরা বৃষ্টি ভেজা পথে নয়, নয় গাছ-গাছালী ও ফল-ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা শান্ত-সিন্ধ পরিবেশে। হবে— আয়লার তাণ্ডবের ফলশ্রুতিতে গৃহস্থর গৃহ ভাসান, মৃত্যুর বিভীষিকার আতঙ্ক, আর গন্ধময় নষ্ট পরিবেশের মানুষের হাহাকারের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে-- সর্ববোধ্য ক্ষমতালিপ্সু অজ্ঞ রাজ-পুরুষের ভারতবর্ষে।

জানার অপেক্ষা--কয়জন রাধারাণী রুক্মিনীকুমারের মতো সমব্যথী স্নেহশীল স্বামীকে পেয়ে সৌভাগ্যের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আর কয়জন আজকের শ্যামলী দুষ্কর্মে লিপ্ত, এক পুরুষের হাত থেকে অন্য পুরুষের হাতে হস্তান্তরিত হয়ে অমাবস্যার অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। বাস্তবের অনেক কঠিন কথা বলে ফেললাম। বাঁচার রসদ হিসেবে আনন্দই ভাল। রথযাত্রার ইতিহাস পড়লে পাই কিছু আশার কথা। ধর্মগ্রন্থ বলে —রথযাত্রার বাহন রথে অধিষ্ঠিত তিন মূর্তি — জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম। এই নারীরূপী সুভদ্রা বিচিত্র শক্তির আঁধার।

মহাভারতে আছে — সুভদ্রা, বলরাম ও কৃষ্ণভগিনী, অর্জুন পত্নী ও অভিমন্যুর জননী। আবার কোথাও আছে সুভদ্রা বিষ্ণু পত্নী লক্ষ্মী। অনেকে বলেন, এটি আদিম সমাজের ভগিনী বিবাহ প্রথার উদাহরণ।

অনেক ক্ষেত্রে জগন্নাথকে সূর্যরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় সূর্যের যিনি তেজরূপ শক্তি — তিনিই রাত্রির গর্ভ থেকে প্রভাতে সূর্যের পাশে এসে দাঁড়ান। তিনিই ঊষা, তিনিই সুভদ্রা — তিনিই সূর্যের তেজকে করে তোলেন তেজদীপ্ত

শক্তিশালী। তাই তিনিই সূর্যকন্যা, সূর্যভগিনী, সূর্যপত্নী।

মহাভারতের কৃষ্ণ-বলরাম ভগিনী সুভদ্রা ব্রহ্মচর্যব্রতী পান্ডব অর্জুনের রূপে মুগ্ধ হয়ে ভ্রাতৃজায়া সত্যভামার শরণাপন্ন হন। তিনিই কলাকৌশলে সকলের অজান্তে গান্ধর্ব মতে ব্রহ্মচর্যব্রতী অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। ভ্রাতা বলরাম কৌরবরাজ দুর্যোধনের সঙ্গে ভগিনীর বিবাহের আয়োজন করেন। কিন্তু কৃষ্ণের চেষ্টায় অর্জুন ও সুভদ্রা মিলিত হয়ে সংসারে অধিষ্ঠিত হন ও বীরপুত্র অভিমন্যুর জননী হন সুভদ্রা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহাপ্রস্থানে যাত্রার প্রাক্কালে যুধিষ্ঠির তাঁর পৌত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে সুভদ্রাকে ধর্মরক্ষা ও সকলের পালনের ভার দিয়ে যান।

যে রথযাত্রার কথা বলছি অর্থাৎ আষাঢ় মাসের রথের অধিষ্ঠিত দেব-দেবীদের কিন্তু হাত নেই। পন্ডিতেরা এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে — ভগবানের হাত নেই। তিনি কিছুই করতে পারেন না। মানুষকেই তাদের সুকর্মের ও দুষ্কর্মের ফলভোগ করতে হবে। এটি তারই প্রতীক।

এখানে কথা হচ্ছে — ধর্মগ্রন্থগুলিতেই তো আবার আমরা দেখি — দেবী লক্ষ্মী তাঁর ধীশক্তি বলে ধর্মরক্ষা করে চলেছেন। আবার ধর্মগ্রন্থগুলির বিশ্লেষণে এও দেখি যে সুভদ্রাই বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী। কাজেই বলতে পারি রথে অধিষ্ঠিত সুভদ্রা রূপী নারী লক্ষ্মী জগৎ সংসারের ধর্মরক্ষা করে ও সমাজ-সংসার পালন করে ঝড়-ঝঞ্ঝাকে সামলে দিয়ে বিশ্বের সামঞ্জস্য বজায় রাখছেন। এটিই তো আশার কথা।

প্রথমেই যে বিষাদের ছায়া দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, সেই বিষাদের ছায়া অনেকখানিই হাল্কা হয়ে আসে যখন নানান জায়গা থেকে খবর আসে অনেক সরকারি পদে অধিষ্ঠিত মহিলা 'আয়লা'-র ক্ষতিগ্রস্তদের সুরাহা করতে এগিয়ে এসেছেন। আর শুধু সরকারি পদে অধিষ্ঠিত মহিলা কেন, অনেক শিক্ষিত-অশিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত গৃহস্থ মহিলাও যে প্রকৃতির তান্ডবের সঙ্গে লড়ছেন, তারাই কি ব্রাত্য? তারাও যে দেবী লক্ষ্মীর প্রতিভূ ,প্রকৃত নারী।

ভারত নির্মাণ অ্যাওয়ার্ড পেলেন

মায়া সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সমাজসেবী হিসেবে এই বছর ভারত নির্মাণ অ্যাওয়ার্ড পেলেন মায়া সিং। ভারতীয় জনতা পার্টির তিনি সদস্য এবং রাজ্যসভার সাংসদ। পুরোদস্তুর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, আর পাঁচজন রাজনৈতিক ব্যক্তির থেকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি তাঁর এলাকায় 'মামিমা' বলেই পরিচিত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে এম এ পাশ করা এই নেত্রী ক্ষমতার অন্ধকারে ডুবে থাকেননি। বরং নিজের ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে সেবা করতে চেয়েছেন। ১৯৮০ সাল থেকে রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাজ সেবার পথ বেছে নেন। অসহায় পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট। গরীব ঘরের ছেলে-মেয়েরা যাতে পড়াশোনা করতে পারে সেই জন্য তিনি গোয়ালিয়রে 'বালক মন্দির' নামে ১০টি বিদ্যালয় তৈরি করেন। গ্রামীণ অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া তফশিলি জাতি এবং উপজাতি মহিলাদের শিক্ষার জন্য তিনি কাজ করেছেন। রাজনীতির মাধ্যমে সমাজ সেবা করার তিনি যে সুযোগ পেয়েছেন তাকে যথাযথভাবে গরীব মানুষের কাজে লাগিয়েছেন।

শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য এই দুই বিষয়ে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেছেন, সমাজের অবহেলিত ও দুঃস্থ মানুষের জন্য। নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা, নারী সুরক্ষা এবং তাদের সংরক্ষণ নিয়ে বারেবারেই তিনি সওয়াল করেছেন।

অসহায় নারীদের আলোর দিশা

নৈহাটির মালা বিশ্বাস

পায়েল বাগচী।। "যিনি রাঁধেন তিনি চুলও বাঁধেন।" এই প্রচলিত প্রবাদকে সামনে রেখে অসহায় দরিদ্র মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছেন উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটির মিত্রপাড়ার বাসিন্দা মালা বিশ্বাস। বিনা পারিশ্রমিকে প্রশিক্ষণ দেন মালাদেবী। একান্ত সাক্ষাৎকারে মালাদেবী জানান, এ জাতীয় হস্তশিল্পের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আজ অনেকে প্রতিষ্ঠিত। পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতা থাকায় মাধ্যমিক পাশ করেও একাদশ

সোসাইটিতে মেয়েরা হাতের কাজ শিখছে। (ইনসেটে মালা বিশ্বাস)

১৯৯২ সালে অসহায় নারীদের নিয়ে গড়ে তোলেন "লাইফলাইন সোসাইটি"। সমাজের পিছিয়ে পড়া মেয়েদের নিয়ে জীবন সংগ্রামে অব্যাহত মালা দেবী। স্থানীয় ঋষি বঙ্কি মচন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ। এরপর কলকাতার "অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট, হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ" থেকে ডিপ্লোমা ইন হেলথ এডুকেশন ডিগ্রি লাভ করেন। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতা ক্যাম্পে গিয়ে এড্স, ডায়েরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগ থেকে নারীদের সাবধান থাকার পরামর্শ দেন। টেলারিং, গ্লাস পেইনটিং, বিউটিশিয়ান, ক্যান্ডেল মেকিং, জুয়েলারী, ফ্লাওয়ার মেকিং, জুটের ব্যাগ, বুটিক নকশা, স্টোন ব্যাগ প্রভৃতি ছাড়াও নানান লুপ্ত শিল্পের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাঁর শিক্ষা কেন্দ্রে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৩০ জন। বন্ধ জুট মিল পরিবারের মেয়েরা ছাড়াও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় নারীদের কাছে এনে শ্রেণীতে ভর্তি হতে না পেরে ছুটে এসেছে মালা দেবীর কাছে। কাঁচরাপাড়ার রীতা সিং, আশা সিং, নৈহাটি গৌরীপুরের পূজা সাউ। এধরনের অনেক অসহায় ছাত্রী হস্তশিল্পের কাজ শিখে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে মালা দেবীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এ ছাড়াও বন্ধ জুট মিল শ্রমিকের কন্যা নৈহাটির লক্ষ্মী সাহা, স্বামী পরিত্যক্তা কাঁকিনাড়ার বিন্দু দেবী, নৈহাটির পিতৃহারা কৃষ্ণা কীর্তনীয়ারা অনুসরণ করেছেন মালা দেবীকে।

অস্ট্রেলিয়ার মতো আমেরিকাতেও হিন্দুদের লাঞ্ছনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ছাত্রদের ওপর একের পর এক হামলার ঘটনার কথা যখন সংবাদের শিরোনামে আসছে তখনই বিশ্বের অন্য দুই প্রান্ত — আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে দুটি পৃথক ঘটনায় হিন্দুদের মর্যাদায় তীব্র আঘাতের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া এডুকেশন বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তারা ওই রাজ্যে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত হিন্দুত্ব বিষয়ক তথ্যকে বিকৃত করেছে। অভিযোগকারী সংস্থাটি ক্যালিফোর্নিয়ার হিন্দু অভিভাবকদের নিয়ে গঠিত 'ক্যালিফোর্নিয়া পেরেন্টস ফর দি ইকুয়ালাইজেশন অব্ এডুকেশানাল মেটিরিয়ালস' বা ক্যাপেম। ক্যাপেমের অভিযোগ, বহু বছর ধরে ক্যালিফোর্নিয়ার পাবলিক স্কুল সিস্টেম আমেরিকায় যুবকদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করছে। ক্যাপেমের মতে, প্রাচীন ভারত ও হিন্দুত্ব নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে যা তথ্য ছিল তা বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যে। ইউরোপকেন্দ্রিক বাইবেলীয় দর্শনে পরিপূর্ণ ওই বইতে হিন্দুত্ব ও প্রাচীন ভারতবর্ষকে কেটে-ছেঁটে দেখানো ও এক কালের উপনিবেশ হিসেবে বিদ্রূপ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ক্যাপেম আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছে, "আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

করছি যে এখানে (ক্যালিফোর্নিয়ায়) আব্রাহামিক (বাইবেল ও কোরানের 'কমন' চরিত্র) মতবাদ শেখানো হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুত্ব সম্পর্কে নেতিবাচক ধ্যানধারণার শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বিগত তিন বছর আগেই ক্যালিফোর্নিয়ায় এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ওই রাজ্যেরই পূর্বাংশে ইউ এস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে এ নিয়ে মামলা দায়ের করে ক্যাপেম। তখন থেকেই চাপ বাড়ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার শিক্ষা দপ্তরের ওপর। এরপর ওখানকার হিন্দু সংগঠন বিষয়টি নিয়ে পথে নামলে সমঝোতার পথে আসতে চায় ক্যালিফোর্নিয়ার শিক্ষা দপ্তর। মামলা তুলে নিতে তারা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে চায় ক্যাপেমকে। ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে ক্যাপেমের বক্তব্য, "আমরা ক্যাপেমের অভিযোগকারীদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে বলতে চাই, যে পরস্পর বিরোধী দুটি পন্থার মধ্যে আমরা একটিই অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি, মামলা আপাততঃ আর চালানো হবে না বলে।" তবে এর পরেও পাঠক্রম না শোধরালে তাঁরা যে আইনি পথেই প্রতিবাদে পুনরায় যাবেন একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার হিন্দু অভিভাবক সংগঠনটি।

তিন রামায়ণের কথা

(১১ পাতার পর)

লন্ডন লীডস এবং ব্রিস্টলে রামায়ণ নাট্যাভিনয়ের পরে ডেভিড এবারে তার অভিনেতাসহ রাম-নাট্যের দল নিয়ে ভারতে আসতে চান। তিনি দেখতে চান ভারতীয় দর্শকদের প্রতিক্রিয়া। যারা রামায়ণের কাহিনী সম্বন্ধে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত।

আমেরিকান রামায়ণ

দুই ।।

বৃটিশ রামায়ণের পরে উল্লেখ্য ইঙ্গ - ভারতীয় লেখক অশোক বাঙ্কারের আমেরিকান রামায়ণের কথা। ভারতীয় পুরাণের প্রতি অনুরাগই রামায়ণের প্রতি তাঁকে আগ্রহী করে তুলেছে। অশোক বাঙ্কার জানান — রাম কাহিনী হলিউডের পর্দায় রূপায়িত হবে। ২০০৬ সালে এ-সম্বন্ধে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়েছিল। হলিউডের একটি স্টুডিয়ো রামায়ণের উপরে তিনটি ফিল্ম বানাতে চেয়েছিল ইংরেজি এবং হিন্দীতে, তোলা হবে ভারতে। কিন্তু অশোক তার আইডিয়া ব্যক্ত করলেন বেন কিংসলে'র কাছে — "মূলত ভারতীয় বংশোদ্ভূত হবার জন্যে বেন-এর ছিল 'মোস্ট এক্সাইটিং ভিশন'। এই বিষয়ে বেন আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে নিকোলে কিডম্যানকে সঙ্গে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।

একথা জানবার পরে স্বভাবতই আমি খুব উল্লসিত হয়েছিলাম।"

এখন অবশ্য ফিল্মের কাজ শুরু হবে এ বছরের মাঝামাঝি। ক্রু এবং শিল্পী নির্বাচন চলছে। অশোক জানেন না নিকোলে স্বয়ং এই ফিল্মে কাজ করবেন কিনা। তার মতে 'সি উইল মেক আ গ্রেট শূর্পনখা'। হলিউড এবং বলিউড দুই জগতের তারকারাই ফিল্মে থাকবেন। এমনকী, ড্যানিয়েল ক্রেগ-এর এজেন্টও ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। অশোকের মতে খুবই ভালো হবে যদি ক্রেগ রাবণের ভূমিকায় অভিনয় করেন, এবং বিভীষণের ভূমিকায় বেন কিংসলে। সীতার ভূমিকায় ঐশরিয়া, রাম অভিষেক এবং অমিতাভ বচ্চন দশরথ।

II Postino-খ্যাত মাইকেল র‍্যাডফোর্ড এই ফিল্ম পরিচালনার ব্যাপারে অশোকের সঙ্গে দেখা করেছেন, কিন্তু হয় তো শেষে অন্য কেউ পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন।

এই রাম সিরিজের লেখক অশোক বাঙ্কার, তাই ভাবা হয়েছিল তিনিই স্ক্রিন প্লে (চিত্রনাট্য) লিখবেন। তিনি প্রথমটি লিখেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখলেন — এই কাজের জন্যে তাকে দু-তিন বছর সময় দিতে হবে যা তার কাছে নেই, সেই সময় তিনি অন্য পরিকল্পনায় নিয়োজিত।

অশোক তার রামায়ণ পুনর্নির্মাণে আধুনিক সেনসিবিলিটির কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, বর্তমানের পটভূমিকায় যাদের রয়েছে অতীত ইতিহাসের প্রতি মোহ-মুগ্ধতা। পাশ্চাত্য দর্শক কীভাবে তার রামকথাকে গ্রহণ করবে সে সম্বন্ধে অশোকের মনে অবশ্যই দ্বিধা সংশয় রয়েছে। নতুন আধুনিক ইডিয়ম ব্যবহার করলেও রামায়ণে কহিনী একান্তভাবেই ভারতীয়, ধর্ম বিষয়ে।

এই রামায়ণ বাস্তবানুগ, থাকবে স্পেশাল এফেক্ট। ফিল্ম নির্মাতারা দর্শকদের ফ্যান্টাসি-প্রিয়তাকে গুরুত্ব দেবেন। দেখা যাক — শেষ পর্যন্ত কোন্ রূপে আবির্ভূত হবে অশোক বাঙ্কারের আমেরিকান রামায়ণ। (তৃতীয় রামায়ণটি পরের সংখ্যায়)।

সোয়াইন ফ্লু বাদ থাকে কেন

(৯ পাতার পর)

তাপমাত্রাতেই রান্না-বান্না করা হয়।

❐ কীভাবে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস ডায়াগনসিস করা যায়?

উত্তর ঃ ইনফেকশন হিসেবে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসকে নির্ধারণ করতে হলে 'সিম্পটম' দেখা যাবার চার-পাঁচ দিনের মাথায় 'রেসপিরেটরি স্পেসিমেন' যেমন কফ, থুতু ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

❐ এই ভাইরাস আক্রান্ত রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধের দোকানে এখনও অবধি কি কি ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে।

উত্তর ঃ ভারতে সেভাবে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। আমেরিকায় যে চারটি অ্যান্টিভাইরাস ড্রাগ পাওয়া যাচ্ছে, তা হল — অ্যামেনটেডাইন, রিমানটেডাইন, ওসেলটামিভির, জানামিভির। এর মধ্যে ডাক্তারদের পরামর্শ ড্রচত্ত্বচ ভাইরাসের জন্য অ্যামেনটেডাইন ও রিমানটেডাইন ব্যবহার করুন।

❐ এই প্রশ্নটা আমাকে নয় মোটেও। প্রশ্ন করছেন বাঙালী জনগণ। প্রশ্নটা রাজ্যের ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে। অনেকটা ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে যেমন ছিল তেমনভাবেই প্রশ্ন করছেন তাঁরা) — ডাক্তারবাবু আমি বাঁচব তো?

উত্তর ঃ (উত্তরটা অবশ্যই এ রাজ্যের ডাক্তারবাবুরাই দিচ্ছেন। অনেকটা গোপাল ভাঁড়ের ঢঙে) যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

সংস্কৃত ভারতীর অভিনব উদ্যোগ

একসঙ্গে দশটি স্থানে সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সংস্কৃত ভাষাকে জনমুখী করতে এক অভিনব উদ্যোগ নিল সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ শাখা। সংস্কৃত ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ প্রমুখ প্রণব নন্দের বক্তব্য অনুযায়ী আগামী ১৬ থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত কলকাতার দশটি স্থানে দশদিনের সংস্কৃত সম্ভাষণ বর্গ শুরু হতে চলেছে। শ্রীনন্দ জানান, সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগ ছাড়াও স্বনামধন্য কয়েকটি সংস্থা এবং সংস্কৃত প্রেমী কিছু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের আন্তরিক সহযোগিতায় এই ধরনের প্রয়াস সম্ভব হচ্ছে। তাঁর মতে ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা জননী সংস্কৃতের ভূমিকা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের বহু বিদেশি বিদ্বানও ভারতবর্ষ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনে সংস্কৃত ভাষার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গেছেন। তথাপি বিদেশিদের ষড়যন্ত্র, আমাদের উদাসীনতায় ভারতবর্ষের বুকেই সংস্কৃত ভাষা আজ উপেক্ষিত। সংস্কৃত ভারতী কয়েক দশক ধরে দেশজুড়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সহজ সরলভাবে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলার এক অভিনব পাঠক্রম তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে সারা দেশে কয়েক লক্ষ মানুষ এই পাঠক্রমের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলতে সক্ষম হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির সঞ্চালন করা হয়েছে। গত ২০০৮-এর ২১ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রায় একশোজন প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং সংস্কৃতের ছাত্রদের নিয়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল হালিশহর নিগমানন্দ মঠে। ওই শিবিরেই সর্বসম্মতিক্রমে সংস্কৃত ভাষা-র প্রচার ও প্রসারের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেই পরিকল্পনাই প্রথম পরীক্ষামূলক প্রয়াস দশটি স্থানে দশদিনের সম্ভাষণ বর্গ। এই দশটি বর্গ হবে দমদম গীতাদেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে, দৈনিক সন্ধ্যা ৬টা থেকে আটটা পর্যন্ত। বড়বাজার লাইব্রেরিতে দৈনিক ৫টা থেকে সাতটা পর্যন্ত। শ্রী অরবিন্দ ভবন শেক্সপিয়ার সরণীতে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত, মুকুন্দপুর সম্মিলনি টির্চাস ট্রেনিং কলেজে দুপুর ১২টা থেকে ২টো। বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে দৈনিক বিকাল ৩.৩০ থেকে ৫.৩০ পর্যন্ত, পিয়ারলেস হাসপাতালের কাছে সুরজওয়ালা চতুস্পাঠীতে সকাল দশটা থেকে ১২টা পর্যন্ত, বিধান সরণী সংস্কৃত ভারতীর কার্যালয়ে সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত, আদ্যাপীঠ মনিকুন্তলা বালিকাশ্রমে সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত, প্রফুল্লকানন কৃষ্ণপুরের সংস্কৃত সদনম্-এ সন্ধ্যা ৬.৩০-৮.৩০ পর্যন্ত এবং শরন্য মাতৃ সেবাশ্রম সঙ্ঘে ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত।

সংস্কৃতের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও যে কোনও আগ্রহী ব্যাক্তি নিঃশুল্কে এই শিবিরে যোগদান করে সংস্কৃতে কথা বলার অভ্যাস করতে পারেন বলে শ্রীনন্দ জানান।

বুদ্ধ-র দিল্লীর চরণে প্রণিপাত

(৫ পাতার পর)

হঠাও — পার্টি বাঁচাও।'

দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের দূর কর — গরীবদের দিকে মুখে ফেরাও।"

তা নইলে গরীবরা তাদের মুক্তিদাতা হিসাবে মাওবাদীদেরই অবলম্বন করবেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে ১৮টি থানা মাওবাদী মুক্ত হলেও কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে যাবার পর আবার মাওবাদী আক্রমণ শুরু হবে। আবারও তৃণমূল, মাওবাদী এক হয়ে সিপিএম-কে আক্রমণ করবে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইথিওপিয়া লালঝান্ডা হাতে যে হত্যাকান্ড হয়েছিল সে সম্বন্ধে তখন কয়েকটি ইংরাজি দৈনিকের বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় — রাস্তায় ১/২ ইঞ্চি সমান রক্ত জমে গেছিলো!

সিপিএম যদি মন্ত্রিসভা রদবদল করে জনগণ নির্ভর পরিষেবা এবং শাসন না চালায় তবে সিপিএম সাইন বোর্ড পার্টিতে পরিণত হবে।

সিপিএম-এর শুদ্ধিকরণের ঢেঁকুর নেহাতই সাময়িক ছিল। কে শুদ্ধি করবে?

সিপিএম দলটাই পচে গেছে। কেরলে নানা কেলেঙ্কারিতে লিপ্ত নেতৃত্ব। রাজ্য সম্পাদকের বিরুদ্ধে সি বি আই তদন্ত হচ্ছে।

কেরল-এর পার্টির মনিটার ছিলেন প্রকাশ কারাত। এটা প্রমাণিত যে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরিবর্তন দরকার। অবশ্যই বিশ্বে এখন মার্কসের চিরায়ত (ক্লাসিক্যাল) সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনও দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি নেই। চীনও চলেছে "নিয়ন্ত্রিত" পুঁজিবাদের পথে।

কাজেই সিপিএমও পুঁজিপতিদের তোষণ করবে। তাইতো বুদ্ধবাবু নিজের সরকারকে বাঁচাতে কেন্দ্রের পদযুগল ধরতে গেছেন। বিগত পাঁচ বছরে কংগ্রেস সিপিএম-এর খোসামোদ করেছিল। আর এই পাঁচ বছর সিপিএম কংগ্রেসের 'দেহি পদ পল্লব মুদারম্' করে নিজেদের স্বার্থ বাঁচাবার এক অসম্ভব চেষ্টা চালাবে। ইতিহাস বড়ই নির্মম।

খেলার জগৎ

মোহনবাগানকে উচিত শিক্ষা দিলেন বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মোহনবাগান ক্লাবের হয়ে জলপাইগুড়িতে প্রীতি ম্যাচ খেলতে না গিয়ে মুম্বাইতে নাচের রিয়েলিটি শোয়ে গিয়ে কোনও অন্যায় করেননি বাইচুং ভুটিয়া। ওই শোয়ে গিয়ে বাইচুং ক্লাবের জার্সি পড়ে পারফর্ম করেছেন, তাতে ক্লাবের জনপ্রিয়তাই বেড়ে গেছে। ভারতের একশো দশ কোটি মানুষের মধ্যে কত শতাংশ মানুষ মোহনবাগানের ম্যাচ দেখে টিভিতে। দশ থেকে পনেরো শতাংশ — যেসব রাজ্যে ফুটবল জনপ্রিয় কেবল সেখানকার মানুষই ভারতের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট দেখে। তুলনায় এই ধরনের রিয়েলিটি শো'র টি আর পি বা ইউ এস পি রেটিং অনেক বেশি। অনেক বেশি মানুষের কাছে বাইচুং ও মোহনবাগানের আবেদন পৌঁছে গেছে তার চ্যাম্পিয়ন হবার সুবাদে। অথচ ক্লাব কর্তারা এ ব্যাপারটা বুঝলই না।

বেনিয়া সমাজের হাতে পড়ে শতাব্দী প্রাচীন দেশগৌরব জাতীয় ক্লাবটির কী দশা হয়েছে। ধীরেন দে, উমাপতি কুমারদের সময়ে যে ক্লাব গোটা দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে রীতিমতো সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিল, সেই ক্লাবে আজ মাৎস্যন্যায়ের যুগ চলছে। যখন তখন কোচকে ধরে কোতল করে দেওয়া থেকে খেলোয়াড়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, কী হয় না। এখন যারা ক্লাব চালাচ্ছেন, তারা নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য মোহনবাগান ক্লাবের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন। এ সত্যটি বাইচুং বুঝেছেন অনেকদিন আগেই এবং তার সাসপেনসনের

অব্যবহিত পরেই যে প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন সমবেত সাংবাদিককুলকে, তাতে এই কথাটি যথেষ্ট জোরালোভাবে উত্থাপিত হয়েছে। বাইচুং-এর নেতৃত্বে যে ফুটবলারদের সংগঠনটি গড়ে উঠেছে, তারা এবার কী করে সবুজ-মেরুনের কর্তাদের বিরুদ্ধে সেটাই দেখার।

এর আগে এরকম ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭৬-এ। সেবার দেশের চ্যাম্পিয়ন দল ইষ্টবেঙ্গলের চার তারকা সুধীর কর্মকার, গৌতম সরকার, তরুণ বসু ও অশোকলাল ব্যানার্জিকে ক্লাব সাসপেন্ড করেছিল বোকারোয় একটি আমন্ত্রণী টুর্নামেন্টে না যাওয়ায়। লিগ শিল্ডের পর নামগোত্রহীন ওই টুর্নামেন্টে যেতে অস্বীকার করে চারজন, পরিণতিতে তাদের ওপর নামে কঠিন শাস্তির খাঁড়া। যে চার তারকা টানা পাঁচ বছর ক্লাবকে সর্বভারতীয় সব টুর্নামেন্টে জিতিয়ে এনেছেন, অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন লাল-হলুদ বিজয় রথ, তাদের লঘু দোষে গুরু দন্ড দিতে হাত কাঁপেনি তৎকালীন ইষ্টবেঙ্গল কর্তাদের। তার ফলও হাতেনাতে টের পেয়েছিল কর্তারা। এরপর বেশ কয়েকবছর ইষ্টবেঙ্গল লিগ, শিল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স সব জায়গাতেই সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। ওই চারজন যেমন ক্লাব ছেড়ে অন্য ক্লাবে নাম লেখায়, তাদের দেখাদেখি আরো বেশ কয়েকজন তারকা দল ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ইষ্টবেঙ্গলদলের স্বর্ণযুগও শেষ হয়ে যায়। এবারও তাই হতে চলেছে। বাইচুং হয়ত ইষ্টবেঙ্গলে চলে যাবেন, দেখাদেখি আরও কতিপয় খেলোয়াড় দল ছেড়ে দেবেন। আর বাইচুং এখন এশিয়া তারকা, সহজে ব্যাপারটা ভুলে যাবেন বলে মনে হয় না। তিনি ফিফার কোট অব আরবিটেসনে নিয়ে যাবেন অনৈতিক সাসপেনসনের বিষয়টিকে। তাকে যদি সঙ্গত করে এ আই এফ এফ, তাহলে ঝামেলায় পড়ে যেতে পারে মোহনবাগানের শাসক গোষ্ঠী। স্বেচ্ছাচারিতার একটা সীমা আছে। এবার তার একটা বিহিত হওয়া দরকার। কড়া শাস্তির মাধ্যমে।

বাইচুং এখন এশিয়া তারকা, সহজে ব্যাপারটা ভুলে যাবেন বলে মনে হয় না। তিনি ফিফার কোট অব আরবিটেসনে নিয়ে যাবেন অনৈতিক সাসপেনসনের বিষয়টিকে। তাকে যদি সঙ্গত করে এ আই এফ এফ, তাহলে ঝামেলায় পড়ে যেতে পারে মোহনবাগানের শাসক গোষ্ঠী।

ভারতের এই ফল প্রত্যাশিতই ছিল

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের ব্যর্থতা নিয়ে যতই ময়না তদন্ত করা হোক না কেন, এই ফল পরিস্থিতি সাপেক্ষে, সবদিক থেকেই বাস্তবনানুগ। আর ব্যর্থতার জন্য ক্লান্তি, অবসাদকে বড় করে দেখানোর মানে হয় না। টেস্ট খেলিয়ে প্রতিটি দেশের ক্রিকেটাররাই বছরে সমসংখ্যক টেস্ট ও একদিনের ম্যাচ খেলে। প্রত্যেকেই আই পি এল খেলে এসেছে, শুধু ভারতীয়রাই নয়। তাই আই পি এল খেলার জন্য বিশ্বকাপে ভাল ফল হয়নি একথা মানার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

বি সি সি আই ও ভারতের বড় বড় শিল্প সংস্থাগুলি ভারতকে জেতাতে কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লাগেনি, তাই যা ফল হবার তাই হয়েছে। আই পি এল এসে যাওয়ায় বোর্ড এখন যথেষ্ট ধনী, কর্পোরেট সংস্থাগুলিও আই পি এল কে কেন্দ্র করে মুনাফা লুটে নিচ্ছে। তাদের কাছে বিশ্বকাপ এখন অপাংক্তেয় সেখানে মুনাফা লাভের পরিমাণ কম। ২০০৭-এ আই পি এল ছিল না তাই ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। অথচ তখন এই ফর্ম্যাটের ক্রিকেটে ভারতীয়রা একপ্রকার 'নবীশই' ছিল বলা চলে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডে ততদিনে চালু হয়ে গেছে কুড়ি ওভারের অন্তঃসারশূন্য ক্রিকেট। ওই চারদেশের খেলোয়াড়রা মোটামুটি রপ্ত করে নিয়েছেন এই ধরনের খেলার ব্যাকরণ। তারা পারল না অথচ ভারত পাকিস্তান ফাইনাল খেলে ফেলল। আসলে ক্রিকেট অর্থনীতিটাই যে দাঁড়িয়ে আছে ভারত ও পাকিস্তানের ওপর ভর করে।

বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডকে খেলায় হারিয়ে সুপার এইটে উঠে শক্ত প্রতিপক্ষের মুখে পড়ে খেই হারিয়ে ফেলে ধোনির ছেলেরা। মাঠে এগারো জন প্রতিপক্ষ আর মাঠের বাইরে তামাম ভারতীয় মিডিয়া, একই সঙ্গে দু'ধরনের প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে হয়েছে তাদের। ধোনির কি দরকার ছিল সাংবাদিককূলকে চটিয়ে দেওয়ার। মিডিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বড় বড় রাজা-মহারাজা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, আর ধোনি তো সামান্য একজন ক্রিকেটার। সহবাগ যে চোট লুকিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এসেছিল, তা তো দিনের আলোর

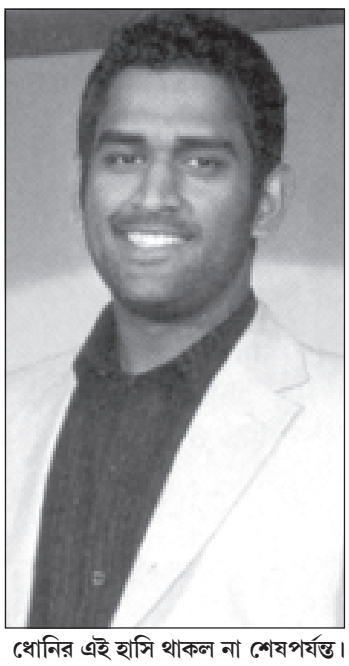

ধোনির এই হাসি থাকল না শেষপর্যন্ত।

মতোই পরিস্কার ব্যাপার। তাহলে এত ঢাকঢাক গুড়গুড় কেন। নেট প্র্যাকটিসে এসে খোঁড়াচ্ছেন। সামান্য 'নকিং' করেই ড্রেসিংরুমে ঢুকে পড়ছেন, এ ব্যাপারটা দেখেও সাংবাদিকরা তাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারবে না, ধোনিও জবাব দেবেন না কোনও প্রশ্নের। পেশাগত তাগিদে সাংবাদিকরা সহবাগ ইস্যুতে প্রশ্ন করলেই ধোনি মুখে কুলুপ এঁটে অন্য কাউকে দেখিয়ে দিচ্ছেন। দিনের পর দিন এ ব্যাপারটা চলতে থাকায় মিডিয়া বুঝে যায় টিমে ধোনি সহবাগ বিভাজন রেখার স্পষ্ট রূপটি। তারা স্টোরি করতেই ধোনি তেলে-বেগুনে জ্বলে সাংবাদিক বয়কটের ডাক দিয়ে বসলেন। তার ফল হাতে-হাতে পেয়ে গেলেন সুপার এইটে।

বোর্ড-বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি কলকাঠি নাড়েনি পর্দার আড়াল থেকে আর মিডিয়াও চায়নি ভারত সেমি ফাইনাল, ফাইনালে খেলুক, তাই ধোনি ব্রিগেড চূড়ান্ত ব্যর্থ। তাছাড়া সাদা চোখে দেখতে গেলে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারটা স্বাভাবিক ঘটনাই। দু'দলেই যে কয়েকজন যোগ্য টি-২০ ক্রিকেটার আছে। ভারতের যেখানে ৪-৫ জন দক্ষ টি-২০ খেলোয়াড় রয়েছে, সেখানে ওই দুই দলে ছয় থেকে সাতজন উপযুক্ত খেলোয়াড় থাকায় ভারত এঁটে উঠতে পারেনি। ওয়েষ্ট ইন্ডিজের তুলনায় অবশ্য ভারত ধীরভাবে এগিয়ে, তাদের বিরুদ্ধে হারটা মেনে নেওয়া যাবে না।

শব্দরূপ - ৫১৪

মধুচ্ছন্দা বড়াল

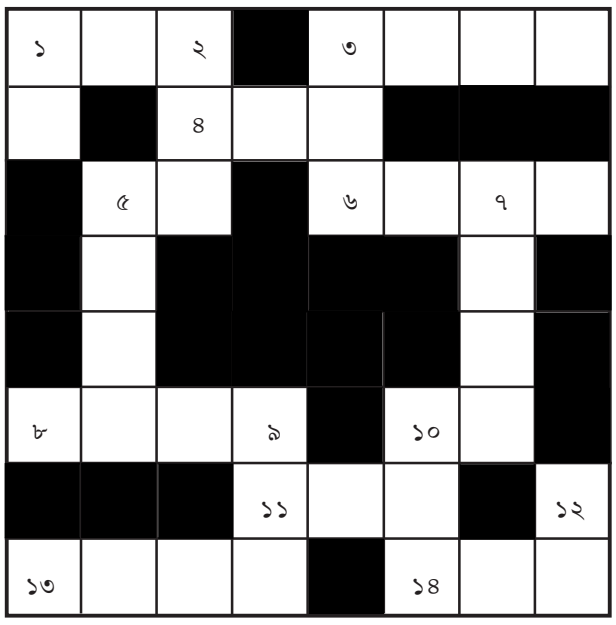

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. নাটমন্দির, চাঁদোয়া-ঢাকা স্থান, ৩. "আমি শ্রী শ্রী — মান্না", ৪. সাগর, ৫.অনাবৃষ্টি, প্রখর রৌদ্র, ৬. একই শব্দে রক্তপদ্ম, স্বর্ণ, তাম্র, বারো অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত ছন্দবিশেষ মধ্যে, নশ্বর, ৮. প্রতিটি খেলায় যা হয়ে থাকে, একে-চারে হস্ত, দুই-চারে নিযুক্ত, ১০. আপন নয়, ১১. বঙ্গীয় শব্দে হ্যান্ডকারচিফ, শেষ দুয়ে পণ্য, ১৩. বঙ্গীয় শব্দে টপ অ্যাঙ্গেল, ১৪. প্রসাদী মিষ্টি, শেষ ঘরে জননী।

উপর-নীচ ঃ ১. অশুভ নক্ষত্রবিশেষ, ২. কে ছুটেছিস — লয়ে (রবীন্দ্র) পূরণীয় স্থানে পণ্য দ্রব্য, ৩. শিষ্টতা, সৌজন্য, সভ্যতা, ৫. ক্রয়কারী, খদ্দের, গ্রাহক, ৭. বাল্মীকির পূর্বনাম, ৯. 'অরুণ প্রাতের — দল চল রে চল রে চল", ১০. নিমেষ, পল, ১২. মাতুল।

সমাধান শব্দরূপ ৫১২

সঠিক উত্তরদাতা

শান্তনু গুড়িয়া
বাগনান, হাওড়া।

■	■	■	ক	■	গা	ভী	ব
■	প্র	মী	লা	■	ন্ধা	■	ং
ব	■	■	ব	ন্ধু	র	■	শ
দ	য়া	ব	তী	■	■	■	গৌ
রি	■	■	■	যু	ধি	ষ্ঠি	র
কা	■	স	মা	ধা	■	■	ব
শ্র	■	ম	■	জি	গী	যা	■
ম	ত	ঙ্গ	■	ৎ	■	■	■

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ জুলাই ২০০৯ সংখ্যায়।

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'

সিপিএম থেকে তৃণমূলে ঃ ভূত ছেড়ে পেত্নীর কোলে

শিবাজী গুপ্ত

সিপিএম-এর তাসের ঘর ভেঙে পড়েছে। জন-গণেশের শুঁড়ের টানে সিমেন্ট চুরি করে শুধু বালির গাঁথনি দিয়ে যে দলীয় ইমারত তৈরি করা হয়েছিল, তা সমুদ্রতটে তৈরি বালির ঘর-বাড়ির মতো একটি প্রবল ঢেউয়ের ধাক্কায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বা যাবার পথে। বড় বড় কথা, মহা মহা আস্ফালন, কথায় কথায় ক্ষমতার পেশী প্রদর্শন সব যেন মুহূর্তে উধাও হয়ে গেছে। নেতারা বৃষ্টিধৌত খড়ের কার্তিকের মতো সব জৌলুস হারিয়ে ম্যাড়ম্যাড়ে ম্যাদামার্কা হয়ে গেছেন। গঙ্গা না হয় আগের মতো খরস্রোতা নয়, কিন্তু রাজ্যটির অবস্থান সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়া সত্ত্বেও সিপিএম নেতারা কেন যে চোরা স্রোতের হদিস পেলেন না তা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার।

শতকরা ৩০টি খাঁটি ভোট, ২০টি মুসলমান ভোট এবং ১০টি কারচুপি ভোটের কল্যাণে সিপিএম ক্ষমতা দখল করত। বিশেষত মুসলমানদের শতকরা ২০টি ভোট ও ১০টি ভেজাল ভোটের জেরেই সিপিএম ধরাকে সরা জ্ঞান করত এবং বুক চাপড়িয়ে আমরা ২৩৫ ওরা ৩০ বলে উৎসাহে নিজেদের পিঠনিজেরা চাপড়াত। তাদের সেই গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। লাল পার্টির মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে লাল বাতি জ্বলতেই সিপিএম চোখে হলুদ সর্ষে ফুল দেখতে থাকে। এদিকে নির্বাচন কমিশনের সতর্ক নজরদারিতে রিগিং মেশিনও তেমন সার্ভিস দিতে পারেনি — ফলং সিপিএম কুপোকাৎ — যা তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

সিপিএম-এর যা হবার তা হয়েছে। যেমন কর্ম তেমন ফল ফলেছে। সিপিএম নিজ কর্মদোষে নিজে ডুবেছে। তাতে দুঃখও হয় না; আহ্লাদও অনুভব করি না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের যে পথে বসিয়ে গেল, তা থেকে উত্তরণের পথ কি? বিগত ৬০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ১০ থেকে যে ৩০-এ উঠেছে সেটা শুধু মুরগীর মতো বাচ্চা জন্মানোর ফলেই ঘটেছে তা ঠিক নয়। বাংলাদেশ থেকে কাতারে কাতারে মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটান হয়েছে — দলের জ্ঞাতসারে এবং ফাঁক ফোকর গলিয়ে। এই অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পেয়েছে, আহার পেয়েছে, নিরাপত্তা পেয়েছে। তারা লোকগণনায় উঠেছে, ভোটার লিস্টে উঠেছে, রেশনকার্ড পেয়েছে, নাগরিক অধিকার পেয়েছে। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে তারা ৩০ বছর সিপিএমকে ভোট দিয়েছে। এখন তারা নিজেদের সংখ্যার গুরুত্ব বুঝে উল্টো পথ ধরেছে। সিপিএমকে ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সংলগ্ন হয়েছে। সিপিএম থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা পাবার তা ষোল আনা আদায় করে তারা সিপিএম-কে তিন তালাক দিয়েছে এবং তৃণমূলকে নিকা করে নতুন সংসার পাতার মতলব করেছে। তৃণমূলও মুসলমানদের নতুন খসম হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে। ফলে — 'মিঞা বিবি রাজী, ক্যা করেগা কাজী'।

স্বাধীনতার ৬০ বছরের মধ্যে বাঙালী হিন্দুকে যে এমন শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা কে জানত? এর থেকে পরিত্রাণের পথ জানা থাকলেও সে পথে হাঁটার সাহস কারও নেই। জেনে শুনে অজগরের গ্রাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? একদিকে অনবরত বাচ্চা উৎপাদন ও অনর্গল বে-আইনী অনুপ্রবেশের ফলে মুসলমান ভোটার সংখ্যা শতকরা ৩০ পৌঁছে গেছে। আর হিন্দু ভোটার সংখ্যা শতকরা ৭০ হলেও তা তিনভাগে বিভক্ত। তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপিতে। বিভক্ত এই ৭০ শতাংশের কোনও রাজনৈতিক গুরুত্বই নেই। বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে হিন্দু ভোট ভাগাভাগি হলে কারও পক্ষেই নির্বাচন জেতা সম্ভব নয় — যদি না মুসলমান ভোটারদের (শতকরা ৩০) হাত করা না যায়। তাই সব রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমানদের দরজায় ধর্না দিয়ে বসে থাকে। শতকরা ৭০ জন হিন্দু ভোটার আজ যদি এককাট্টা হতে পারত, তা হলে আর মুসলমান ভোটের তোয়াক্কা না করলেও চলত। কিন্তু মুসলমান ভোটের জন্য কাঙাল সাজা যাদের বদভ্যাসে দাঁড়িয়েছে, তাদের কাছে স্বধর্মাবলম্বীর ভোটে নির্বাচিত হবার মানসিকতা ও মর্যাদাবোধ আশা করাই বৃথা।

সুতরাং সিপিএমের পরাজয়ে ও তৃণমূল কংগ্রেসের জয়লাভে হিন্দু ভোটারদের আহ্লাদিত হবার কিছু নেই। তারা ভুতের কবল থেকে মুক্ত হয়ে পেত্নীর খপ্পরে পড়েছে। এবং অদূরে ভবিষ্যতে যে মামদোর করাল গ্রাসের শিকার হবে, তাতে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। স্বাধীনতার ৬০ বছরের মধ্যে বাঙালী হিন্দুকে যে এমন শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা কে জানত? এর থেকে পরিত্রাণের পথ জানা থাকলেও সে পথে হাঁটার সাহস কারও নেই। জেনে শুনে অজগরের গ্রাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। হায়, বাঙালী হিন্দু!

ক্রিকেটকেও হাতিয়ার বানাচ্ছে আই এস আই
ভারত সরকারের হুঁস নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ক্রিকেটকেও হাতিয়ার বানাচ্ছে আই এস আই। ভারত-পাকিস্তান খেলা দেখার নাম করে অনেক এজেন্টই এদেশে ঢুকে পড়ছে। বছরের পর বছর ধরে তারা এদেশে থেকেও যাচ্ছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ পুলিশ কানপুর থেকে এমনই এক এজেন্টকে গ্রেপ্তার করে। নাম বকাস আহমেদ। বকাস ২০০৫ সালে খেলা দেখার নামে ভারতে আসে। প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে বহাল তবিয়তে সে ভারতে ঘুরে বেড়ায়। বকাস পুলিশের কাছে এঘটনা স্বীকারও করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশের মহানির্দেশক পাকিস্তানীদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের এঘটনা শুধু সে রাজ্যের ক্ষেত্রেই বিপদ নয়, সমগ্র ভারতে এমন বহু বকাস লুকিয়ে রয়েছে। যাদের বেশিরভাগই খেলার নামে ভারতে আসে।

কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছ থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ২০০৭ সালে প্রায় সাড়ে সাত হাজার পাকিস্তানী ভারতে আসে। যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। কেন্দ্র সরকারের কাছেও তাদের কোনওরকম খবর নেই। উল্টে পাকিস্তানীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বিগত কয়েক বছরে সেই সংখ্যা বেড়ে ন'হাজারের ওপর দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংখ্যার বৃদ্ধি ইউপিএ সরকারের আমলেই। যাদের বেশির ভাগই ভারতে আসে খেলা দেখতে। এই সমস্ত পাকিস্তানীদের বয়স আঠারো বছরের ওপর। পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই তাদের ব্যবহারও করছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এত সবের পর 'হেল দোল' নেই সোনিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউপিএ সরকারের। এখানেও কি ভোটের সমীকরণ? এটাও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকের কাছে।

নকল ওষুধ ভারতের বলে বিক্রি করছে চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। ভারতের বিরুদ্ধে চীন এখনও ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। থেমে থাকেনি। কখনও অনুপ্রবেশ, কখনও বা সীমান্ত অধিগ্রহণের চেষ্টার ঘটনার খবর প্রায়ই আসছে। বিশ্বের সামনে ভারতকে হেয় করতে বড় সড় ষড়যন্ত্র শুরু করেছে চীন। সেদেশের ওষুধকে ভারতের ওষুধ বলে বিদেশে পাচার করছে চীন। ভারতের অনুকরণে লেবেল তৈরি করে ওষুধের গায়ে সেঁটে দিচ্ছে তারা। ফলে চোখে দেখলে বোঝার উপায় থাকছে না, ওষুধটি আসল না নকল। ইতিমধ্যেই চীন বেশ কিছু ম্যালেরিয়ার ওষুধ বিদেশে পাচার করেছে। আফ্রিকার কিছু দেশে তারা তা পাচার করে বলে জানা গেছে।

ভারতের বাজারকে ধাক্কা দিতেই চীনের এই ফন্দি। সেই সঙ্গে এই নকল ব্যবসায় মোটা অঙ্কের টাকাও তুলতে চাইছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই ভারত সরকার জানতে পেরেছে। কেন্দ্র সরকার চীনের এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করেছে। চীনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস চীন সরকারের কাছে এর তদন্তের দাবী জানিয়েছে। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনায় যুক্ত অফিসারদের শাস্তির দাবীও তোলা হয়েছে।

নাইজেরিয়া সরকার শুরুতেই চীনের পাঠানো ম্যালেরিয়া ওষুধে সন্দেহ প্রকাশ করে। মেড ইন ইন্ডিয়া লেবেলটাতেও খটকা লাগে তাদের। ওষুধগুলি পরীক্ষা করতেই চীনের পর্দা ফাঁস হয়। দুধ জলের ফারাক পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এখনই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে — তা ভাবতে নারাজ। চীন ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কোনও ওষুধ নকল করছে কিনা, তা পরিষ্কার নয়। অন্য কোনও দেশে তা পাচার হয়েছে কি হয়নি, তাও জানা যায়নি।

প্রয়াত ডাঃ ভুবন মোহন মাইতির শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

সংবাদদাতা ।। গত ৪জুন ত্রিপুরার আগরতলায় কৃষ্ণনগরস্থিত ছাত্রী নিবাসে, পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম (পশ্চিমবঙ্গ)-এর অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সর্বজনপ্রিয় কার্যকর্তা প্রয়াত ডাঃ ভুবন মোহন মাইতি-র অকাল প্রয়াণে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কল্যাণ আশ্রমের সকল অনুরাগী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতেই প্রয়াতের উদ্দেশ্যে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয় এবং উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিগণ তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। বিভিন্ন বক্তা তাঁর কর্মধারা, কর্মজীবন এবং নানা দিক আলোকপাত করেন। উল্লেখ্য, তিনি ত্রিপুরাতে ১৯৮৯ থেকে ২০০২ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

কল্যাণ আশ্রমে ১৬ বৎসর কর্মের মধ্যে একমাত্র সংগঠনের চিন্তা ছাড়া তাঁর আর কোনও চিন্তা ছিল না। তিনি ছিলেন অকৃতদার। তাঁর বিদেহী আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে এই সভা শেষ হয়।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-র স্বয়ংসেবক রামগোপাল শর্মা পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর। তিনি স্ত্রী তিন ছেলে এক মেয়ে ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন। তিনি বিজেপি-র পুরুলিয়া জেলা সভাপতি ছিলেন।

Swastika
29 June - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

অমরনাথ যাত্রা এবার আরও বিপদসঙ্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। একদিকে তীব্র দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, অন্যদিকে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ — এই দু'য়ের যাঁতাকলে পড়ে নাভিশ্বাস উঠছে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের। অমরনাথ গুহার আবহাওয়া এই মুহূর্তে তীব্র দুর্যোগপূর্ণ। তীর্থযাত্রীরা অমরনাথ গুহায় যাত্রা শুরু করেন সাধারণত পহেলগাঁও থেকে। প্রায় ৪৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পৌঁছাতে হয় গুহায়। ওই পথে থেকে থেকেই তীব্র শিলাবৃষ্টি হচ্ছে, ধস নেমেছে রাস্তায়। গত ১৫ জুন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে সেনাবাহিনীর বদলে ওই উপত্যকার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ওপর বর্তেছে। যদিও পাক্-সন্ত্রাসীদের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের আঁতাত কোনও নতুন ঘটনা নয়। প্রতি বছরই নিয়ম করে সন্ত্রাসবাদী হামলা হচ্ছে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ওপর। এবছরও তার ষোল আনা সম্ভাবনা আছে। অথচ তীর্থযাত্রীরা যাতে ফের সন্ত্রাসবাদীদের শিকার হন, সেই ব্যবস্থাই সুকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকার করছে বলে রাজনৈতিক মহলের

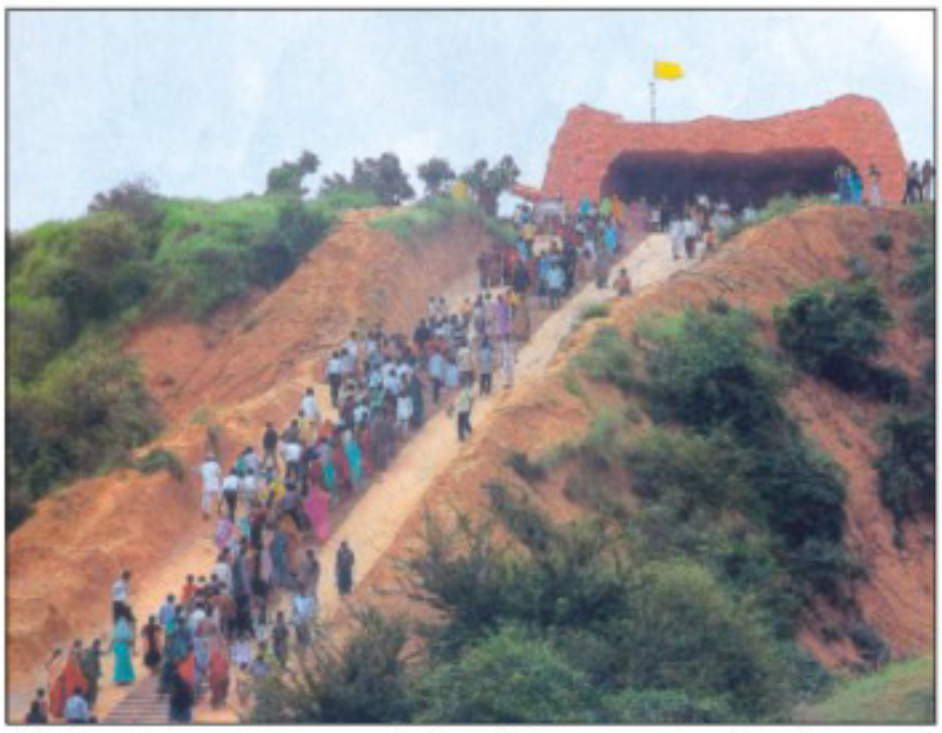

তীর্থযাত্রীদের যাত্রারম্ভের কথা থাকলেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করা যায়নি। তাই এবার চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে শ্রী অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের পক্ষ থেকে অন্য একটি সংক্ষিপ্ত পথ যেটি বালতাল ঘুরে যায়, সেই পথেই যাত্রা করার কথা ভেবে রাখা হয়েছে। কিন্তু বালতালের ওই পথেও আবহাওয়া যথেষ্ট দুর্যোগপূর্ণ থাকায় যাত্রা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। এদিকে ভারত সরকার জম্মু-কাশ্মীর থেকে AFSPA (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ারস্ অ্যাক্ট) আইনকে অভিযোগ। ক্রমাগত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে যথেষ্ট চাপের মধ্যে পড়েছে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই। সেই কারণে পাহাড়ের পথ সুগম করার কাজে নামাতে হয়েছে সেনাবাহিনীকে। শ্রাইন বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বি বি ব্যাস গত ১৪ জুন বরিষ্ঠ সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। ইতিমধ্যেই বিনামূল্যে রন্ধনশালা বসানো হয়েছে অমরনাথ ধাম যাওয়ার পথে পথে এবং ওই তীর্থক্ষেত্রের কাছাকাছি অঞ্চলে। এছাড়াও শ্রাইন বোর্ডের তরফ থেকে তীর্থযাত্রীদের বিশ্রাম নেবার জন্য ১৫টি কুটির এবং ৮৫টি অস্থায়ী শৌচাগার স্থাপন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

শ্রাইন বোর্ডের এক মুখপাত্র বলেছেন, "রাজ্যপাল এন এন ভোরা যিনি একইসঙ্গে মন্দিরের বোর্ডেরও সদস্য রয়েছেন, আশা করা যায় ওই পুণ্যস্থানে প্রথম পুজোর জন্য তিনিই উৎসর্গকারীদের নেতৃত্ব দেবেন।" ওই মুখপাত্র আরও বলেছেন, যে কদিন যাত্রা চলবে সেই কদিন প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে সকাল ৯টার মধ্যে বালতাল বেসক্যাম্পের পেছনে জড়ো হওয়ার জন্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রাইন বোর্ড সূত্রের খবর, বালতালে একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। যেখান থেকে প্রতিদিন আবহাওয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি জানানো হবে এবং বেস ক্যাম্প থেকে অমরনাথ গুহামন্দির পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার পথের যাবতীয় খবরাখবরও সরবরাহ করা হবে।

একদিকে আবহাওয়া যখন অমরনাথ যাত্রীদের কিছুটা দুশ্চিন্তায় রাখছে, অন্যদিকে সর্বনাশা আইন-কানুন প্রয়োগ করে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলছে ভারত সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আগেই ঘোষণা করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর থেকে AFSPA (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্ট)-কে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। যে আইনের বলে ওখানকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পুরো দায়িত্বটাই আস্তে আস্তে নাকি জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এখন চাপে পড়ে সরকার এনিয়ে আলোচনার আশ্বাস দিচ্ছে। আসলে কেন্দ্রীয় সরকার অদ্ভুত রকমের একটি যাঁতাকলে পড়ে গেছে। ওখানকার আর্মি বেস ক্যাম্পগুলি মূলত কাশ্মীরের মানুষের অধিকারের জায়গাগুলির ওপরই অবস্থান করছিল। শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারত সরকার তাই ওই ক্যাম্পগুলি সরিয়ে নেবার সাথে সাথেই সেনাও তুলে নিতে শুরু করে। কিন্তু এতে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ দক্ষিণ কাশ্মীরে সোপিয়ানের ঘটনা। যেখানে দুই যুবতীকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও তারপর খুন করা হয়। এবং তাকে কেন্দ্র করে জঙ্গি সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে কাশ্মীর। কাশ্মীরে তুষারপাত বন্ধ হলেই আবার পাক অনুপ্রবেশকারীদের দৌরাত্ম্য বাড়বে। সেই কথা মাথায় রেখেই সেনাপ্রধান দীপক কাপুর বলেছেন, "জম্মু ও কাশ্মীরে সেনাসংখ্যা কমানোর ব্যাপারটা অমরনাথ যাত্রী এবং গ্রীষ্মের পর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।" প্রতি বছরই জঙ্গিদের হিটলিস্টে থাকে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের নাম। এবারও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের AFSPA আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত যে তীর্থযাত্রীদের বিরুদ্ধেই যাবে এতে কোনওরকম সন্দেহ নেই। দীপক কাপুরের কথা শুনে মনে হচ্ছে, চোর পালালে তাঁদের বুদ্ধি বাড়বে। প্রতি বছরই জঙ্গি হামলার শিকার হচ্ছেন অমরনাথ তীর্থযাত্রীরা। যাচ্ছে বহু

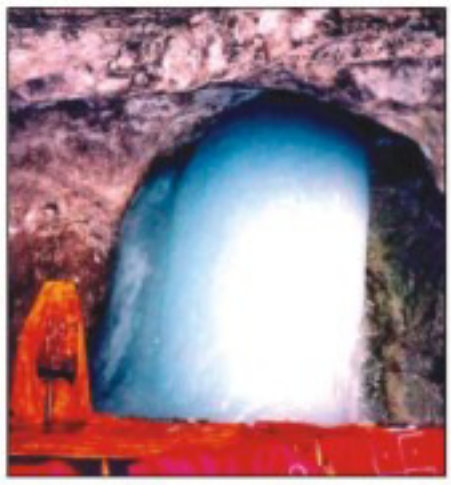

তীর্থযাত্রীর প্রাণ। তারপরেও কেন এই প্রাণঘাতী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার তা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে। দু'বছর আগে শ্রী অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের ঐতিহাসিক আন্দোলন ওই পুণ্যভূমির জমি পুনরুদ্ধার করেছিল। আজও সেই রকম কোনও আন্দোলন হয়ত বাঁচাতে পারে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর জীবন।

শ্রাইন বোর্ড তীর্থযাত্রীদের পরামর্শ দিয়েছে, তাঁরা যেন শুধুমাত্র ট্রাউজার পরেন, শাড়ি বা ধুতি জাতীয় কিছু না পরেন। এর কারণ হিসেবে শ্রাইন বোর্ড বলছে হিমালয়ের পর্বতমালার রাস্তা এমনিতেই হড়হড়ে ও পিচ্ছিল। তার ওপর সমগ্র পথটিতে যখন অমরনাথ তীর্থযাত্রীরা ট্রেকিং (পাহাড়ে চড়ার বিশেষ কৌশল) করবেন তখন ধুতি বা শাড়ি তাঁদের পরনে থাকলে তা পায়ে জড়িয়ে পড়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। সেদিক দিয়ে ট্রাউজার (পাজামা ধরনের পোষাক) যথেষ্ট নিরাপদ। সেইসাথে তীর্থযাত্রীদের এও বলা হয়েছে যে তাঁরা যেন সঙ্গে করে ছাতা, টর্চ, ওয়াকিং স্টিকস, উলের গরম জামাকাপড় এবং আবশ্যক ঔষধপত্র নিয়ে আসেন। সেইসঙ্গে শ্রাইন বোর্ডের আবেদন বৃদ্ধ ও শিশুদের আনার ব্যাপারে তীর্থযাত্রীরা যেন পুনরায় চিন্তাভাবনা করেন।

মঞ্চে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম মিত্র, ক্ষীরোদ দাম, সত্যব্রত পাল ও সতীশ বর্মন।

শিলিগুড়িতে সঙ্ঘের দ্বিতীয়বর্ষ প্রশিক্ষণ শিবির সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ২০ জুন, শনিবার বিকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রথম বর্ষ এবং উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সম্মিলিত দ্বিতীয় বর্ষ প্রশিক্ষণ শিবিরের সমারোপ উৎসব হয়ে গেল। এদিন দার্জিলিং পাবলিক স্কুল প্রাঙ্গণে সঙ্ঘের রীতি অনুযায়ী প্রথমে ধ্বজোত্তলন, শারীরিক ও ব্যান্ড-বিউগল বাদ্যের প্রদর্শন হয়। প্রার্থনার পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সমারোপ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন শিলিগুড়ি কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ক্ষীরোদ দাম এবং প্রাস্তবিক ভাষণ দেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের বৌদ্ধিক প্রমুখ অসীম কুমার মিত্র। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, এতবার ইসলামিক আক্রমণের পরও ভারত আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্ঘই দেশকে একতাবদ্ধ করে রাখতে পারবে। শ্রীমিত্র বলেন, পঞ্চদশ লোকসভাতে ৫৪৩ সাংসদের মধ্যে ১৫০ জনের নামে ৪১২টি দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। দুর্ভাগ্য হল, এসব দেখেও আজকের সংবাদ মাধ্যমগুলি নীরব। তারা শুধু গোধরা নিয়ে কাঁদুনি গাইছে, কিন্তু ১৯৮৪ সালে শিখ হত্যার কথা ভুলে গেছে। সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ভারতে শক্তিশালী জাতীয় চেতনাবোধ জাগ্রত করা, যাতে হিন্দুজাতির দিকে কেউ বাঁকা চোখে তাকাতে না পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৩১ মে শিলিগুড়ির কাছে দার্জিলিং পাবলিক স্কুলে সঙ্ঘের এই দুই বর্গ শুরু হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি ইস্কন মন্দিরের মহারাজ আনন্দ বর্ধন ও বর্গের সর্বাধিকারী সতীশ বর্মণ উপস্থিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের প্রথম বর্ষের বর্গে ১২টি জেলা (সাংগঠনিক) থেকে ৯৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পুরো পশ্চিমবঙ্গ থেকে দ্বিতীয় বর্ষের বর্গে ৮৬ জন শিক্ষার্থী যোগ দেয়। এর মধ্যে দক্ষিণ বর্গের সংখ্যা ৫৫ জন। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী, বিদেশ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদানন্দ সপ্রে, অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, ক্ষেত্রীয় সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রীয় প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী ও অজিত মহাপাত্র এবং দুই বঙ্গের প্রান্তীয় প্রচারক এই বর্গ পরিদর্শন করেন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের একটি মুহূর্ত।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com